KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : আই-এ ১৭৭, সল্টলেক সিটি, সল্ট লেক কলকাতা - ৯১
Collection : KLMLGK	Publisher : অমিত মুখার্জি
Title : অনার্য সাহিত্য (ANARJYO SAHITYA)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 2	Year of Publication : Oct - Dec 1995
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : শ্যামল মজুমদার	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সল্টলেক অনার্য সাংস্কৃতিক সংস্থা দ্বারা প্রকাশিত
বিকৃত সংস্কৃতি বিরোধী ত্রৈমাসিক

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অনার্য

অনার্য

প্রস্তুতি সংখ্যা ২ ★ অক্টোবর—ডিসেম্বর '৯৫

সলিল চৌধুরী, সবিতাব্রত দত্তের প্রয়াণে আমরা মর্মাহত। ওঁদের শিল্পী-জীবনের দায়বদ্ধ সময়টুকুর প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

সম্পাদক : শ্যামল মণ্ডল

প্রকাশক : সল্টলেক অনার্য সংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষে অমিত মুখার্জী
আই-এ ১৭৭, সেক্টর তিন, সল্ট লেক, কলিকাতা-৭০০০৯১

মুদ্রক : বাণীশ্রী, ১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : সজল দাস

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়'র বদলে ৩
সংস্কৃতি বনাম এ্যান্টি সংস্কৃতি—অনুপম কাঞ্জিলাল ৪
একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পঞ্চাশ বর্ষ—শামসুল ইসলাম ১১
কবিতা : সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরী, অঞ্জন কর, অমর পোদ্দার,
স্বাতী চট্টোপাধ্যায়, শামল মন্ডল ১৭—২১
গল্প : নোবেল আমেরিকান সার্কাস—জুলফিকার সুসং ২২
মাইকেলের চোখে রাম আগ্রাসী আর্য প্রতিভূ—সোমেশ দাশগুপ্ত ৩০
মার্কিন সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন—কিছু কথা—প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় ৩৭
'৯৪ নভেম্বর থেকে '৯৫ নভেম্বর পর্যন্ত
সল্টলেক অনার্য সাংস্কৃতিক সংস্থার চালচলন নিয়ে কিছু কথা ৪৩
পীপ্‌ল্‌স্‌ রাইটার্স ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত ৪৭

সম্পাদকীয়'র বদলে :

সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলো পরিচালিত হচ্ছে বহুজাতিক সংস্থার নির্দেশে। আমাদের ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, লোককৃষ্টি এমন কী ভালবাসা-বন্ধুত্ব-সুস্থ সামাজিক সম্পর্ক-সাম্রাজ্যবাদী সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসে জর্জরিত।

তথাকথিত বিখ্যাত নামিদামি পত্রপত্রিকা গোষ্ঠী জটিল, বিমূর্ত, অশৈল্পিক অবাস্তব সাহিত্য মহাউল্লাসে বিক্রি করছে।

জমির দালালের মত রঙ-বেরঙের বিকৃত সাহিত্য-সংস্কৃতির দালাল ঘুরছে খোলাবাজারে। সকাল সন্ধ্যায় শয়তানের বাক্স উপাসনায় মত্ত লক্ষকোটি মানুষ। নন্দনের পথ ঘুরে এ্যাকাডেমিতে বিজ্ঞাপনদাতা আয়োজিত 'সমাজ-সচেতন' চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, চিত্রকলা আর নাট্য উৎসব।

সরকারী প্রগতিশীলবাবুদের ঠিকা নেওয়া সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলন, সেখানেও বহুজাতিক সংস্থা পর্দার আড়ালে দক্ষ পরিচালকের মত কলকাঠি নাড়ে।

ভারতীয় জনতার স্বাধীকার, মনন, চিন্তা, বোধবুদ্ধিকে বন্ধক দিয়ে আমাদের পন্ডিত প্রধানমন্ত্রী মহাশয় 'গ্যাট চুক্তিতে' স্বাক্ষর করার পরে পরেই উপন্যাস লেখায় হাত দেন। প্রচারের সর্ববৃহৎ মাধ্যম শয়তানের বাক্সে প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ের চালচলন প্রচারের খরচই কোটি কোটি টাকা।

কর্মহীন বেকার জীবনগুলো যদি এক লাইনে দাঁড়ায় তাহলে সেই লাইন এ মহাদেশ ছাড়িয়ে অন্য মহাদেশে পৌঁছে যাবে অনায়াসে। অথচ আজকের প্রজন্মের মস্তিষ্কে অত্যন্ত সুক্ষভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে নিরাপত্তা ছাড়া এ জীবন হতশ্রী আর বিজ্ঞাপনদাতারাই ওদের অভিভাবক।

আগামী প্রজন্ম কোন পথে ? সামাজিক দায়বদ্ধতা, না বিকৃত রুচিহীন জীবনের জন্য উৎসর্গিত চিন্তা-চেতনা !

আজকের এই টালমাটাল সময়ে 'সাম্রাজ্যবাদী সাহিত্য সংস্কৃতি' শব্দ উচ্চারণে এবং প্রতিরোধে আমাদের কোন দ্বিধা-দ্বন্দ নেই। ছোট পত্রিকা, নাটক, গান চলচ্চিত্র আন্দোলনকে যতই প্রগতিশীল বিপ্লবী বলে আমরা দাবী করি না কেন—তা বিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকলে ওরা ভয় পাবে না বরং আনন্দে শিকারী চিলের মত ডানা ঝাপটাবে।

ওরা ভয় পায় প্রকৃত প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক স্থায়ী মঞ্চকে। □

সংস্কৃতি বনাম এ্যান্টি সংস্কৃতি

অনুপম কাঞ্জিলাল

আজকের সমাজে সংস্কৃতি ও এ্যান্টি সংস্কৃতি (অপসংস্কৃতি বা বিকৃত সংস্কৃতি) দ্বন্দ্বের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হিসেবে সামনে এসেছে, বস্তুত এই দ্বন্দ্বটিকে সামনে রেখেই সমাজে সামাজিক বিভাজন রেখাটি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই দ্বন্দ্বটা আজকের নয়, বিবর্তনের ধারায় সমাজ যখন থেকে শ্রেণী বিভক্ত হয়ে পড়তে শুরু করলো, তখন থেকেই এই দ্বন্দ্বের শুরু, তবে এই দ্বন্দ্বটা প্রথম অবস্থায় আজকের মতো এতো স্পষ্ট ও তীব্র ছিলনা। এই দ্বন্দ্বের স্বরূপ বুঝতে, সংস্কৃতি ও এ্যান্টি সংস্কৃতি কি, তার উৎস কোথায় সেটা বুঝে নেওয়া দরকার। বলা বাহুল্য তার মধ্যেই নিহিত আছে এই দ্বন্দ্বের চাবি-কাঠি। যেহেতু শ্রেণী বিভাজনকে কেন্দ্র করেই এই দ্বন্দ্বের উৎপত্তি, সেহেতু শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাসের উপর বিশ্লেষণী আলো ফেলেই এই দ্বন্দের ক্রমবিবর্তনের স্বরূপ চিহ্নিত করা সম্ভব।

সংস্কৃতি বলতে এখন যেমন শুধু নাচ-গান-সাহিত্য শিল্প চারুকলা ইত্যাদিকে তুলে ধরা হচ্ছে, সংস্কৃতি ব্যাপারটা আদৌ শুধুমাত্র এসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এগুলো সংস্কৃতির এক-একটা অংশমাত্র। সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন কর্ম প্রয়াসের সামগ্রীক রূপ, এই অর্থে কোন সময়কার সমাজ ব্যবস্থাই সংস্কৃতি বিহীন ছিল না। প্রতিকুল শত্রুভাবাপন্ন পরিবেশের সাথে লড়াই করে তাকে অনুকুল করে গড়ে তোলবার যে সংগ্রাম মানুষ সৃষ্টির আদি অবস্থা থেকে শুরু করেছে সেটা সংস্কৃতিরই অংগ, সেই সংগ্রামটা আজও চলছে। তাই বলা যায় সংস্কৃতি হচ্ছে, সৃষ্টির আদি অবস্থা থেকে আজ পর্যন্ত সভ্যতাকে ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে আমার পক্ষে পরিচালিত বিভিন্নমুখী কর্মপ্রয়াস এবং তার ফলে বহু জীবন ও শ্রমব্যয়ের বিনিময়ে অর্জিত অভিজ্ঞতার সারসংকলন। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জনসমষ্টি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছে ও চালাচ্ছে, ফলে স্থান বিশেষে সংস্কৃতির রূপ ভিন্ন, তার কোন

সার্বজনীন রূপ নেই-থাকা সম্ভবও নয়—এটা যেমন সত্য তেমনি এটাও সত্য যে, সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখা ও তাকে ক্রম-বিকশিত করে তোলার লক্ষে পরিচালিত বলে (সভ্যতার সামগ্রিক কল্যান সাধনের পক্ষে পরিচালিত নয়, এমন কোন কর্মপ্রয়াস সংস্কৃতি বলে বিবেচিত হতে পারেনা—তা আসলে এ্যান্টি সংস্কৃতিরই নামান্তর) সব সংস্কৃতিরই একটা সাদৃশ্য ছিল ও আছে। প্রতিটি স্থানেই শ্রম ব্যয়ের সংস্কৃতিটাই সভ্যতার চলিষ্ণুতার চাবি কাঠি।

এটা এখন সকলেরই জানা যে, সভ্যতার আদিপর্বে উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল একেবারেই সহজ ও সরল, তখন উৎপাদন ব্যবস্থার উপরে কোন গোষ্ঠী বা ব্যক্তির নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত হয়নি, ফলে সমাজে একটা সাম্যতা বজায় ছিল এবং এই একই কারণে প্রথম দিককার সংস্কৃতিও ছিল বিকৃতিমুক্ত, কিন্তু কালক্রমে মনুষ্য জাতির বুদ্ধির সাথেই চাহিদা ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর সাথে সঙ্গতি রাখতেই অপরিহার্য হয়ে পড়ে শ্রমবিভাজন। এই শ্রমবিভাজনের ফলে একদিকে যেমন উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেল, তেমনি আবার অন্যদিকে সমাজ ব্যবস্থাও আরো জটিল আকার ধারণ করতে শুরু করলো। মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঘটে যেতে থাকে ব্যাপক রদবদল। এক শ্রেণীর মানুষ ক্রমশই উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রন কায়েম করতে শুরু করে, অন্যদিকে ব্যাপক অংশ তাদের 'শ্রমের ফসল' থেকে বিযুক্ত হতে থাকে। শুরু হয়ে যায় শ্রেণী-বৈষম্য, তাই বলা যায় শ্রম বিভাজনকে অবলম্বন করেই শ্রেণী বিভাজন সমাজে থাবা বসিয়েছে, শ্রেণী বিভক্ত সমাজের প্রতিটি স্তর নানা দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়তে থাকে, নিজেদের স্বার্থেই এই দ্বন্দ্বকে চাপা দিয়ে রাখতে, সমাজের কতৃত্বে থাকা শ্রেণীর চাহিদা অনুযায়ী, সমাজ বিবর্তনের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে।

উৎপাদন ব্যবস্থার উপর এক শ্রেণীর কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পরই তারা সচেষ্ট হয়ে ওঠে কতৃত্বকে যুক্তি সিদ্ধ করে তুলতে এবং উপদ্রবহীন ভাবে তা বজায় রাখতে। এ ব্যাপারে তাদের প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে রাষ্ট্র ও এ্যান্টি সংস্কৃতি। আগে বলা হয়েছে সংস্কৃতি হচ্ছে সমষ্টি মানুষের স্বার্থের সঙ্গে পরিচালিত সামগ্রীক কর্মপ্রয়াস, এই সংস্কৃতির বিকৃতি ঘটিয়েই এ্যান্টি সংস্কৃতির উৎপত্তি অর্থাৎ যে সংস্কৃতি সমষ্টির স্বার্থের পথ থেকে সরে এসে নির্দিষ্ট একটা গোষ্ঠী বা ব্যক্তির স্বার্থের পথে ওকালতি করে—তাই

আসলে এ্যান্টি সংস্কৃতি। এর প্রধান লক্ষ, মানুষকে সামাজিক মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, তাকে ব্যক্তি মানুষ হিসেবে খুঁচিয়ে তোলা, 'মানুষে মানুষে যূথবদ্ধতাকে ভেঙ্গে দেওয়া। এ্যান্টি সংস্কৃতির ধারক বাহক যারা, তারা জানতেন এবং জানেন ব্যক্তি মানুষের পথে কিছুতেই সামাজিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়, ব্যক্তি মানুষ সমস্যার কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য। তাই মানুষকে ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরে তাকে আত্মস্বার্থ সর্বস্ব করে তোলার লক্ষেই এ্যান্টি সংস্কৃতি তাড়িত। শাসক সম্প্রদায় তাদের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই, বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার একেবারে সূচনা লগ্নেই এই এ্যান্টি সংস্কৃতির আমদানি করেছিল। এই এ্যান্টি সংস্কৃতি দিয়েই রাষ্ট্রকে 'নিরপেক্ষ' বলে তুলে ধরা হয় এবং তার প্রতি সমাজের সকল শ্রেণীর আনুগত্যকে প্রশ্নহীন করে তোলার প্রয়াস চলতে থাকে। সমাজের প্রতিটি স্তরে এ্যান্টি সংস্কৃতির ধ্যান ধারনা ছড়িয়ে দেওয়া শুরু হয়, যাতে করে সমাজের প্রতি অংশের মানুষ এই এ্যান্টি সংস্কৃতির পথে শর্তাধীন হয়ে পড়ে, বলাই বাহুল্য সমাজের প্রতিটি অংশে নিজেদের কর্তৃত্ব থাকায়, শাসক সম্প্রদায় খুব অনায়াসেই এ কাজে সফল হয়। এ্যান্টি সংস্কৃতির পথে শর্তাধীন হয়েই শোষিত নিপীড়িত মানুষ ক্রমশই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে থাকে, সমস্যায় জর্জরিত অথচ প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের শক্তিহীন এক অসহায় অবস্থায় নিমজ্জিত! শোষিত মানুষের এরকম অসহায় মানসিক অবস্থাটাই শোষক শ্রেণীর একান্ত কাম্য। এবং এই অবস্থাটা বজায় রাখতেই আমদানি হয় ধর্মনামক এ্যান্টি সংস্কৃতির। প্রতিকুল অবস্থাকে অনুকুল করে গড়ে তোলবার যে সংস্কৃতি মানুষ রপ্ত করেছিল তার প্রয়োজনের তাগিদে, ধর্ম এসে সেটাই গুলিয়ে দেয়, 'সমস্ত জগৎ সংসারকে নিয়ন্ত্রণ করছে এক অদৃশ্য শক্তি, তার ইচ্ছাতেই সবকিছু হচ্ছে এবং হবে, তিনি কাউকে হাসাচ্ছেন কাউকে কাঁদাচ্ছেন' এবং তারপরে 'এ জগতের সব কিছুই মায়া' ধর্মের এই সব তত্ব কথা, ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতার কারণেই প্রকৃতির অপার রহস্যভেদ করতে সক্ষম না হওয়া মানুষ গ্রহণ করে বসে, এবং এর মধ্যেই নিজেদের বাস্তব জীবনের জ্বালা যন্ত্রনার সান্ত্বনা খুঁজতে থাকে? কালক্রমে এটা পরিণত হয় সংস্কারে এবং এর ফলেই এটা শর্তহীন প্রক্ষোভের মতো কাজ করতে শুরু করে। এভাবেই ধর্ম নামক এ্যান্টি সংস্কৃতিটা সাধারণ মানুষকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে। ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখার অদৃশ্য শক্তিটা কোথাও হয়েছে ভগবান, কোথাও আল্লা আবার কোথাও বা গড্। যে ন্যায় বিচারটা ছিল নিশ্চিত আর ভগবান নিতান্তই অনিশ্চিত, এ্যান্টি সংস্কৃতির দাপট সেটাকেই উল্টে দেয়, ভগবানকে নিশ্চিত করে ন্যায় বিচারটাকে করে তোলে অনিশ্চিত। এমনি করেই শোষিত নিপীড়িত মানুষের বিদ্রোহের হুঙ্কারকে অসহায় দীর্ঘশ্বাসে রূপান্তরিত করে দেওয়ার কাজটা সম্পন্ন হয়ে যায় ধর্মীয় সংস্কৃতির মধ্যস্থতায়। তাই নির্মোহ মন নিয়ে ইতিহাসের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ধর্ম সব সময়েই শাসক শ্রেণীর ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। অনেকে বলেন (যেমন কিছুদিন আগে একটি বাংলা দৈনিকে একজন পত্র লেখক লিখেছিলেন) ধর্মের মোহে শুধু শোষিত শ্রেণীই তো নয় শাসক শ্রেণীও তো মজে আছে, এক্ষেত্রে বলা যায় তাতে শাসক শ্রেণীর কোন ক্ষতি হয় নি বা হয়না, ক্ষতি যা হবার তার পুরোটাই হয় শোষিত মানুষের, শোষণ থেকে মুক্তি পেতে হলে তাই শোষিত মানুষকে ধর্ম নামক এ্যান্টি সংস্কৃতির প্রতি মোহ ত্যাগ করতে হবে। কারণ এই ধর্মই তাদের যূথবদ্ধতা ভেঙ্গে তাদের শক্তিহীন ক'রে উর্দ্ধতম কর্তৃপক্ষের কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পনের যুক্তি হাজির করে, তাদের উপর চলতে থাকা অন্যায় অবিচারগুলোকে পূর্বজন্মের পাপের ফল বলে চিহ্নিত করে আসল শত্রুদের আড়াল করে দেয়। 'সব পাবে ওপারে' এই তত্ত্ব কথায় ভুলিয়ে চোখের সামনে সমস্যাজীর্ণ বাস্তব জগৎটা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে করে তোলে উদাসীন, কিভাবে জটিল বাক্যজাল বিস্তার করে সমাজের একটা মুষ্টিমেয় শ্রেণীর পক্ষে শোষণ-শাসন ভোগের যুক্তি আমদানি করা যায় এদেশের বেদ, গীতার ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে রয়েছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ। মনে রাখতে হবে এ্যান্টি সংস্কৃতি হিসেবে ধর্ম হচ্ছে শাসক শ্রেণীর সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। প্রশ্ন উঠতে পারে আজ বিজ্ঞান যেখানে তার বিপুল সফলতা প্রমাণ করতে পেরেছে, সেইযুগে দাঁড়িয়ে ধর্মের মতো একটা নিতান্তই ভাববাদী বিষয় কি করে শাসক শ্রেণীর এ্যান্টি সংস্কৃতির প্রসারে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে? এখানে এটুকুই বলা যায় যে, শ্রেণী বৈষম্যমূলক সমাজে বিজ্ঞানের যুক্তি সবার কাছে পৌঁছোয় না। তাছাড়া বিজ্ঞানের সফলতা এলেই সবার মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে উঠবে তার কোন মানে নেই, এর জন্য চাই ব্যাপক কর্ম প্রয়াস, সেটা এ্যান্টি সংস্কৃতির বিরোধী, তাই এ্যান্টি সংস্কৃতির গার্জেন বাবুরা সে কাজে বাধা দেয়। তাই বিজ্ঞানের শক্তিকে কাজে লাগিয়েই ধর্ম নামক এ্যান্টি সংস্কৃতিটা আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এদেশের বিভিন্ন

'গুরুবাবারা' বিজ্ঞানের শক্তিতে ভর করেই অলৌকিকতার ভেল্‌কিবাজি দেখান, ধর্ম হচ্ছে এ্যান্টি সংস্কৃতির এমন একটা দিক যার প্রভাব পড়ে সমাজের প্রতিটি স্তরে, মানুষের ব্যক্তিগত ভাবনা থেকে শুরু করে সিনেমায়, নাটকে, শিল্প সঙ্গীতে সর্বত্রই ছড়িয়ে যায় ধর্মের প্রভাব। তবু এ্যান্টি সংস্কৃতি শুধুমাত্র ধর্মের মধ্যেই আটকে নেই, সমাজের বিভিন্ন কর্ম প্রনালীর মধ্যেই তা ছড়িয়ে রয়েছে।

বিবর্তনের ধারা বেয়ে সমাজ যতোই জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে, তার সাথে সমানুপাতিকভাবেই বিভিন্ন ফর্মে এ্যান্টি সংস্কৃতিরও মান ও মাত্রার প্রসার ঘটানো হয়েছে। আজকের সমাজে এ্যান্টি সংস্কৃতির দাপট খুবই স্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে এর কারণ এটা এখন আর সাধারণ মানুষের চেতনাকে শুধুমাত্র ভোঁতাই করছেনা, একই সাথে হয়ে উঠেছে মুনাফার এক অতি শক্তিশালী অবলম্বন। বাজার বাবুরা তাই সকলে মিলে হামলে পড়েছেন এই নোংরা সংস্কৃতির প্রসারের উদ্যোগ নিতে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বলতে যা বোঝানো হয় তা আসলে এই এ্যান্টি সংস্কৃতির হামলাবাজী, পন্য সর্বস্ব ব্যবস্থার পক্ষে জনমত তৈরী করতেই এ্যান্টি সংস্কৃতির হামলা নামিয়ে আনা হয়। এই হামলার নমুনা এদেশের সর্বত্রই এখন বিরাজমান, সস্তা পচা সিনেমা, নাটক, গানের বিপুল জনপ্রিয়তা, নানা বিচিত্র বর্ণের পোষাক-আশাকের রমরমা আর সমাজের প্রতি উদাসীন এক আত্মস্বার্থ সর্বস্ব মানসিকতা প্রমাণ করছে, এ্যান্টি সংস্কৃতির হামলা এদেশে ভালো মতই কাজ করতে শুরু করেছে। রাষ্ট্র তার স্বভাব মতোই এই এ্যান্টি সংস্কৃতির পৃষ্ঠ পোষকতায় মগ্ন। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাও রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বাহক, তাই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও কোথাও মানুষকে 'চেতনার দাসত্ব' থেকে মুক্তি দেওয়ার প্রয়াস নেই, নেই সুস্থ সুন্দর কোন 'বোধ' তৈরীর তাগিদ। এদেশের তথা কথিত ডিগ্রিধারীরাও তাই সব 'ভাগোর' হাতে ছেড়ে দিয়ে হাপ্ ছেড়ে বাঁচেন, নির্বিচারে গিলতে থাকেন নোংরা নাটক, সিনেমা, গান, কেউবা ভাল করে পরীক্ষায় পাশ করার পর 'কৃতজ্ঞতা'র ঠেলায় বিচিত্র বর্ণের বাঁক কাঁধে নিয়ে কোথাকার কোন এক বাবা পার করে গা বলে চিৎকার করতে করতে যায় 'বাবা'র কাছে। বিজ্ঞানের দাপুটে অধ্যাপক মাথা মুড়িয়ে বাপের শ্রাদ্ধ করতে বসেন। আর মার্কসবাদী নেতার নাতির পৈতের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হন মার্কসবাদী নেতৃবৃন্দ। এ্যান্টি সংস্কৃতি এভাবেই সব কিছু একাকার করে দেয়। বলে দেওয়া দরকার ভাববাদ ও ভোগবাদই হলো এ্যান্টি সংস্কৃতির প্রধান উপাদান। প্রশ্নহীন

আনুগত্যটাই এ্যান্টি সংস্কৃতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাই বলেছেন 'চেতনার দাসত্বে'র কথা। মানুষকে এ্যান্টি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংস্কৃতির পক্ষে শর্তাধীন করে তোলার জন্য 'চেতনার দাসত্ব' থেকে তাকে মুক্তি দেওয়াটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

বর্তমান প্রেক্ষিতে সংস্কৃতির পক্ষে লড়াই করা বলতে বুঝতে হবে, শোষণ-হীন-শাসনহীন সাম্যমূলক এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলে বিজ্ঞান ও যুক্তির যাবতীয় সফলতা ও সুযোগ সুবিধা সমাজের সকলের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়ে যে কর্ম-প্রয়াস চলছে তাকে দিনের পর দিন বৃদ্ধি ঘটাবার চেষ্টাকে। মানব সভ্যতার সত্যিকারের বিকাশ বলতে যা বোঝায়, তার সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক একেবারে অবিচ্ছেদ্য এবং একই ভাবে বিপরীত দিক থেকে সভ্যতার অধঃপতনের সার্থে এ্যান্টি সংস্কৃতির সম্পর্ক ও অবিচ্ছেদ্য। আজকের সমাজে লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা, নোংরা মূল্যবোধ সর্বস্বতা সবকিছুই এ্যান্টি সংস্কৃতির অনুপোষী।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে একটা বিষয় নিশ্চয়ই পরিষ্কার যে সংস্কৃতি ও এ্যান্টি সংস্কৃতি এই দুয়েরই আমদানি ঘটেছে, প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই, অর্থাৎ সংস্কৃতি বা এ্যান্টি সংস্কৃতি, উদ্দেশ্যমূলক হতে তা বাধ্য। তাই যে সব পন্ডিতের দল সংস্কৃতির আবার সামাজিক দায়বদ্ধতার কি থাকতে পারে, বলে আল্‌গা মন্তব্য করেন তাঁরা হয় সংস্কৃতির সামগ্রীক রূপ সম্পর্কে অসচেতন এবং ইতিহাসের বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে নিতান্তই অজ্ঞ নতুবা নিপাট ভন্ড। সংস্কৃতির সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক সবচেয়ে কাছের, তাই এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা বক্তব্য উল্লেখ করা যায় (আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, এমন কি অনেক মার্কসবাদী পর্যন্ত, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সব ভাবনাকেই সমালোচনার ঊর্ধ্বে ভাবেন, তাঁরা দোহাই, আমার এই বাক্যটিকে উপেক্ষা করে যাবেন) 'কালান্তর' প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ, প্রয়োজনের প্রকাশ নয়। অথচ আমরা সকলেই জানি তিনি 'কালান্তর' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন এদেশের এক বিশেষ সময়ে, বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে। সুতরাং তাঁর প্রবন্ধ তৈরীর উদ্দেশ্যটাই তাঁর প্রবন্ধের বক্তব্যকে বাতিল করে দেয়। তাই সংস্কৃতির উদ্দেশ্যকে এড়িয়ে যেতে চাইলে স্ববিরোধিতায় জড়িয়ে পড়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না, তা সে যেই হোন না কেন।

আমার আলোচনায় এতক্ষনে এটাও পরিষ্কার যে এ্যান্টি সংস্কৃতির দাপট

এখন তীব্র। কিন্তু তা বলে সংস্কৃতি শেষ হয়ে গেছে? না, তা সম্ভব নয়, এ্যান্টি সংস্কৃতি সমাজের সামগ্রিক বিকাশ সাধন করতে পারে না, এটা মানুষকে শুধু স্বার্থপর হতে শেখায়, ব্যক্তিকে সমষ্টির মাথায় কাঠাল ভেঙ্গে নিজের লাভের অংক বাড়িয়ে যেতে প্ররোচিত করে। এমনিভাবে আত্মস্বার্থে মগ্ন মানুষ সমাজে নানা সমস্যা ও দ্বন্দ্বের আমদানি করে। উৎপাদন ব্যবস্থার প্রকৃতিটাই এখন তার উপর দাবি করছে সামাজিক মালিকানা, কারণ বিজ্ঞানের সহায়তায় উৎপাদন ব্যবস্থাটা তার উৎপাদনকে এমন একটা স্তরে উন্নীত করতে পেরেছে, যেখানে কিছু মুষ্টিমেয় মানুষ তা ভোগ করেও শেষ করতে পারছে না, ফলে তৈরী হচ্ছে 'উদ্বৃত্ত পণ্য', উৎপাদন ব্যবস্থার উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলেই একমাত্র এই 'উদ্বৃত্ত পণ্যে'র সম বণ্টনের ব্যবস্থা করা সম্ভব এবং উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরো বিকশিত করাও সম্ভব, বলা উচিত উৎপাদন ব্যবস্থার উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠাই উৎপাদন ব্যবস্থার ক্রম বিকশিত হওয়ার শর্ত। কিন্তু সেক্ষেত্রে সমাজে নির্দিষ্ট শ্রেণীর কর্তৃত্ব বিলীন হবে, তাই শাসক সম্প্রদায় জোর করে এ্যান্টি সংস্কৃতির সহায়তায় এটাকে আটকে রাখতে চাইছে, আর এটা করতে গিয়ে এরা আটকে পড়েছেন দ্বিমুখী সমস্যায়, একদিকে সংস্কৃতিকে প্রতিরোধ করার সমস্যা অন্যদিকে 'উদ্বৃত্ত পণ্যে'র বাজার পাওয়ার সমস্যা। আজ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে পুঁজিওয়ালাদের যে ছুটোছুটি চলছে, তাও কি বাজার খোঁজার তাড়নায় নয়? এই দ্বিমুখী সমস্যাই এ্যান্টি সংস্কৃতির ধারক বাহকদের সমাধি শয্যা রচনা করে এবং সেটা সৃষ্টির অমোঘ নিয়ম মেনেই করে। ইতিহাস তাই প্রমাণ দিচ্ছে, সমাজে যাবতীয় কর্তৃত্ব বজায় রেখেও এ্যান্টি সংস্কৃতির ধারক বাহকরা সমাজ-বিপ্লব আটকাতে পারেন নি। সমাজ বিবর্তনের ধারায় প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধের 'থিসিস' ও 'এ্যান্টি থিসিসে'র দ্বন্দ্ব থেকে বার বার উঠে এসেছে 'সিনথিসিস'। আজকের প্রেক্ষিতে সংস্কৃতিকে অবশ্যই হতে হবে প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধের 'এ্যান্টি থিসিস', সেটাই এ্যান্টি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে সভ্যতাকে নিয়ে যাবে ক্রম বিকাশের পথে। □

একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পঞ্চাশ বর্ষ

শামসুল ইসলাম

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (১৯৪২—১৯৯৪) তাদের শিল্প জীবনের পঞ্চাশ বছর সম্পূর্ণ করেছে। 'ইপটা' নামেও পরিচিত এই নাট্য আন্দোলন যাকে সাংস্কৃতিক আন্দোলন বলাটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে, ১৫ই মে ১৯৪৩-এ বম্বেতে সুস্পষ্ট কিছু দুর্বলতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এ সেই সময় যখন ভারতের মানুষ ও তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এক অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থার ভেতর দিয়ে চলেছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং য়ুরোপে ফ্যাসিবাদী অত্যাচারের ভয়ানক পরিণাম ভারতবাসীকে তীক্ষ্ণ ও গভীর ভাবে প্রভাবিত করে। বিদেশী শাসকদের ষড়যন্ত্রের ফলে সমস্ত দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এই সংকটজনক পরিস্থিতির পাশাপাশি বাংলায় ভীষণ মন্বন্তর ঘটানোর জন্যে বিদেশী শাসক ও দেশী কালোবাজারীদের জোট সম্পূর্ণভাবে দায়ী ছিল। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সাংস্কৃতিক কর্মী, শিল্পী ও নাট্যকারেরা এই অবস্থার মোকাবিলা করতে এগিয়ে এলেন। ফ্যাসিবাদ, শাসকবাহিনীর লুণ্ঠতরাজ, মন্বন্তর এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সাংস্কৃতিক কর্মীরা দলবদ্ধভাবে পথে নাবেন।

এই নয়া সাংস্কৃতিক জাগরণে বাংলা অগ্রেকবার নেতৃত্ব দেয়। বিনয় রায়ের নেতৃত্বে ১৯৪২ এ-ই 'বেঙ্গল কালচারাল স্কোয়াড, অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কাজ শুরু করে। উক্ত স্কোয়াড সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর মাধ্যমে মন্বন্তর আক্রান্তদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহে সক্ষম হয়। বেঙ্গল কালচারাল স্কোয়াড ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে। এদের যেসব গানগুলি দেশে সাড়া জাগিয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—

'পুরব দেশ মে ডুগ্গী বাজী, ফায়লা দুম কা জাল,
দুম কি আগ কোওন বুঝায়ে সুখ গ্যায়ে সব তাল,
জিনকে হাতো নে মোতি রোপে আজ ওহী কাঙ্গাল—

রে সাথী আজ ওহী কাঙ্গাল / ভুখা হ্যায় বাঙ্গাল
রে সাথী ভুখা হ্যায় বাঙ্গাল / 'ইপটা চাহে আজাদি',
'লানত হ্যায় সরমায়েদারি জিসনে দুনিয়া ভুখো মারি,
এয়সা চৌপট রাজ থে ইসকা হো মজদুর কি দুনিয়া সারি'।

["পূবের দেশে ডুগডুগী বাজে
দুঃখ বার্তা সেথায় ছড়ায়
দুখের আগুন কে ওয়ালো
সকল সুখ যে পোড়ে
যার হাতেতে মুক্তো ফলে
সেই যে ভিক্ষে করে
ও ভাই সেই যে ভিক্ষে করে
বাংলা খিদেয় মরে (সাথী)
বাংলা খিদেয় মরে।
ইপটা মুক্তি কামী, ঠিক সে ক্ষমতাকামী
(যে) দুনিয়ার পেটে পদাঘাত করে
তার মাথা যাক্ ধুলোয় পড়ে
সগৌরবে মজদুর, দেশকে চালনা করে।"]

এই স্কোয়াড যেখানেই যেত সেখানেই এ ধরণের সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠত। এই প্রচেষ্টারই পরিণামে ১৫ই মে ১৯৪৩ সালে সমস্ত দেশের সাংস্কৃতিক কর্মীরা বম্বেতে একত্রিত হন এবং IPTA স্থাপিত হয়। মজদুর নেতা এম. এন. জোশীকে অধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয় এবং সম্পাদক হন অনিল ডি'সিলভা। বিনয় রায়, মোয়াজা আহমেদ আব্বাস, মকদুম মোহইদ্দিন, ডাঙ্গে, সজ্জাদ জাহির, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ডঃ রাজা রাও ইত্যাদিদের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হয়। অধ্যাপক হিরেন মুখার্জী এই সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, "আসুন লেখক ও শিল্পীরা—আসুন অভিনেতা ও নাট্যকারগণ, আপনারা হাত ও মস্তিষ্ক ব্যবহার করে কাজ করেন, আসুন এবং নিজেদের স্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায়পূর্ণ একটি বীর্যপূর্ণ সমাজ গঠনের কাজে সমর্পিত করুন।"

একটা কথা বোধ হয় খুব কম লোকেই জানে যে IPTA-র নামকরণ

করেছেন আমাদের দেশের এক মহান বৈজ্ঞানিক—হোমী জাহাঙ্গীর ভাবা। উনি ১৯৪২ সালে শ্রীঅনিল ডি' সিলভাকে এই নামটি গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন। IPTA-এর বিধিবদ্ধ গঠনের পূর্বে দেশে বম্বে, কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর, আগ্রা, মাইসোর, লাহোর, গৌহাটি, হায়দ্রাবাদ, ঢাকা ইত্যাদি স্থানে বিভিন্ন ধরণের গণসংস্কৃতিমূলক সঙ্গীত-নৃত্য এবং নাটক অনুষ্ঠিত করত। এবং সেই সংগঠন, যারা একত্রিত হয়ে IPTA নামে একটা নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলন গঠন করে। সঙ্গীত নৃত্য, নাটক, সিনেমা এবং সাহিত্যজগতের সঙ্গে যুক্ত এমন খুব কম ব্যক্তিত্বই ছিলেন যাঁরা IPTA আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

IPTAর আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রগতিশীল সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ ঘটে গেল। দ্বিধাহীনভাবে এটা বলা চলে যে IPTA যেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূত্রপাত, পৃথিবীর ইতিহাসে ঠিক সেই রকমের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গোনাগুণতি কয়েকটি উদাহরণ পাওয়া যাবে। IPTA দেশকে কজন মহানতম গীতিকার, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা ও অভিনেত্রী দেওয়ার সাথে সাথে ভারতীয় থিয়েটারকে একটি নতুন পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু এও সত্য যে IPTAর স্বর্ণময় যুগ ১৯৪৭এর আসার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়। যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন দেশের মানুষের আশা এবং আকাঙ্খাকে আত্মস্থ করেছিল, সেগুলিকে গৌরব এবং আদর্শের জায়গায় বসিয়েছিল, তাতে অত্যন্ত দ্রুত ভাঙন ধরে! বিখ্যাত বয়োজ্যেষ্ঠ অভিনেতা জোহরা সেহগল এর মতে ১৯৪৭ এর স্বাধীনতা IPTAর মুখ্য agenda গুলোকেই ছিনিয়ে নিয়েছিল যা ছিল বিদেশী শোষণ শাসনের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক আন্দোলন। দেশের মানুষের মুক্তি এখন আর কোনো বিষয় হিসেবেই পরিগণিত নয়, এবং এই কারণে IPTAও নিজেকে উদ্দেশ্যহীন মনে করতে থাকে। দেশবিভাগ এবং কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মধ্যে বিশৃঙ্খলাও IPTAর দারুণ ক্ষতি করে।

যাই যোক, ইপটার পতনের আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণ ছিল। সত্য এটাই, ইপটাকে CPI-র ভুল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্য দিতে হয়েছিল, ৪০-র দশক, এর সাক্ষী বহন করছে। CPI-র আদর্শগত বোঝাপড়ার ফাঁক ও দোদুল্যমানতার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল একটার পর একটা চরম অসাফল্য। রনদিভের গ্রামভিত্তিক বিপ্লবের স্বপ্নকল্পনা পার্টিকে ঠেলে দিয়েছিল সংশোধনবাদের এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের ফাঁদে। ইপটার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বৃহৎ

কর্মকাণ্ডগুলি পরিচালিত হচ্ছিল রাজনৈতিক সংগঠনের কঠিন আমলাতান্ত্রিক শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থার মধ্যে দিয়ে। অথচ রাজনৈতিক সংগঠন, নিজের বৈপ্লবিক চরম লক্ষ্যের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলো না। তেলেঙ্গানার কৃষক আন্দোলনের বৈপ্লবিক সম্ভাবনাগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছিল CPI বিশ্বাস-ঘাতকতা। ইপটার ধারাবাহিক ভাঙ্গনের শর্তগুলোই ছিলো রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং লক্ষ্যহীনতা, অধিকাংশ ভাঙ্গনই যে খুব আদর্শগত কারণে হয়েছিলো এ ঘটনা নয় ফলে ইপটার বৃহতসংখ্যক কর্মীরা হয় বসে গিয়েছিলেন আর নয় বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে গিয়েছিলেন বঙ্গের চলচ্চিত্র জগতে। এই কারণগুলো ইপটাকে অরাজনৈতিক অগভীর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের দিকে ঠেলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কংগ্রেসের সাথে CPI-র আঁতাতের ফলে ইপটার অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় অতীতের বস্তুবিশেষ। যারা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের প্রতি আকর্ষিত হয়ে ইপটায় এসেছিল তাদের রাজনৈতিক চিন্তায় বিকশিত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলো ইপটার নেতৃত্ব। ব্যতিক্রম সামান্য কিছু মধ্যবিত্ত রোমান্টিক বিপ্লবী। এঁদেরকে আবার রাজনৈতিক লোক জড় করা ও অর্থ সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করা হত মাত্র। রাজনৈতিক নেতৃত্ব সহ সাংস্কৃতিক কর্মীদের মদ্যসক্ত এবং পরদারগামী হয়ে যাবার ঘটনাগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া হত, তার মানেই এ নয় যে দেশজুড়ে ইপটার কর্মীরা ছিলেন বিশৃঙ্খল এবং কু-অভ্যাসের দাস। বরং বিভিন্ন পর্যায়ে কেন্দ্রীয় স্তরে রাজনৈতিক ব্যর্থতা, পতন ও অবিমৃষ্যকারীতার পরও বৃহত মফঃস্বল বা গ্রামাঞ্চলে এঁরা অর্থাৎ বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কর্মীরা, বিপ্লবী নাটক, নাচ ও সঙ্গীতের আলো জ্বালিয়ে রেখেছিল।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ একটি আন্দোলন হিসেবে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এবং কোন দিকে যেতে চাইছে স্পষ্ট ধারণা করা যেতে পারে। সেই তিনটি সুবর্ণজয়ন্তী কার্যাবলীকে মাথায় রেখে যেগুলি বম্বে, পাটনা ও কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতায় IPTAর সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হয় অত্যন্ত জাঁক-জমকের সঙ্গে। প্রায় এক লক্ষ লোক ভর্ত্তি খুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মার্কসবাদী মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে ইলা অরুণ ও নীনা গুপ্তের টিম 'চোলী কে পিছে.....' গান গেয়ে হৈ-চৈ ফেলে দেন এবং এভাবেই IPTAর পঞ্চাশ বৎসর পূর্তিতে আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করা হয়। বোম্বাই-এ অন্য একটি আয়োজনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন সিংহ এবং সুখরামের উপস্থিতিতে IPTAর ৫০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায়

২৫ মে, ১৯৯৪ এ একটি ডাকটিকিট বার করা হয়।

কিন্তু এই জাঁকজমক এবং সরকারী কার্যক্রম ছাড়াও IPTA আন্দোলনের প্রতি সমর্পিত কয়েকজন দায়িত্ববোধ সম্পন্ন কর্মকর্তা এই শক্তিশালী আন্দোলনকে পুনর্জীবিত এবং পুনর্নির্মাণের কাজে যুক্ত আছেন। এঁরাও IPTAর গণ-সাংস্কৃতিক স্বরূপ এর অনুরূপ পাটনাতে ২৩ থেকে ২৭শে ডিসেম্বরের ভেতর সুবর্ণজয়ন্তী সমারোহের আয়োজন করে। এই সমারোহ বাস্তবিক IPTAর লোকধর্মী স্বরূপ এবং রাষ্ট্রব্যাপী চরিত্রকে তুলে ধরে। এই সমারোহে আগত দেশের ১৯টি প্রান্ত থেকে সাংস্কৃতিক কর্মীদের স্বাগত জানিয়ে সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত সিয়ারাম তেওয়ারি বলেন "পাটনায় সাধারণত আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলির মত এটি একটি সমারোহ মাত্র নয়। এই আয়োজন ভারতীয় সাংস্কৃতিক নবজাগরণের অভিমুখে তোলা একটি পদক্ষেপ ... ...আমি আশা রাখি বিভিন্ন ধারার মুখ্য প্রতিনিধিরা একসাথে বসে ভারতের সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে একটা নতুন দিশা দেবার প্রচেষ্টা করবেন।"

পাটনার এই সমারোহের বৈশিষ্ট্য ছিল যে মঞ্চাভিনীত নাটক, পথনাটক এবং নৃত্যানুষ্ঠান বিভিন্ন জায়গায় হয় এবং পাশাপাশি রঙ্গকর্ম, সঙ্গীত, সাহিত্য সঞ্চারমাধ্যম, বিজ্ঞান, ললিতকলা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত সমস্যার উপরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলে। এই সমারোহে কৈফী আজমী, বাবা নাগার্জুন, এ. কে. হাঙ্গল, প্রফঃ আর এস শর্মা, প্রফঃ যশপাল, রাজেন্দ্র রঘুবংশী, রাজেন্দ্র যাদব, উষা গাঙ্গুলী, শৌকত আজমী, জিতেন্দ্র রঘুবর্ণশী, প্রবীন কেসর সকলে অংশ গ্রহণ করেন। পাটনায় IPTAর আয়োজনের একটা বিশেষ ব্যাপার ছিল যে এখানে IPTA তিনটি প্রজন্ম মিলিত হয়। IPTA তাদের এই আয়োজনে সাংস্কৃতিক কর্মীদের জন্য একটি মানপত্র প্রস্তুত করেন যেখানে বলা হয়েছিল সাংস্কৃতিক ব্যবসা এবং ক্রীতদাসত্ব বন্ধ করা হোক, 1876এর ড্রামাটিক পারফরমেনস্ আ্যাকট রদ করা হোক, শিল্পীদের সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা সুরক্ষিত হোক এবং তাদের ওপর আক্রমণ বন্ধ হোক, আর সংস্কৃতি ও সঞ্চার মাধ্যমে বিদেশী আগ্রাসন বন্ধ হোক।

IPTAর পাটনা স্বর্ণজয়ন্তী আয়োজনে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িশ্যা এবং আসাম এর নাট্যগোষ্ঠীরা ছাপ ফেলতে সমর্থ হন। উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার থেকে যেমন প্রতিনিধিরা আসেন তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে

এই দুটি প্রান্তে IPTA পঞ্চাশাধিক গোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছেন। জম্মু IPTA-ও তাদের একটি টীম প্রবীন কেশরের নেতৃত্বে পাটনায় পাঠায় এবং তারা লোকনৃত্য এবং গণনাট্যের মাধ্যমে পাটনার দর্শককে মুগ্ধ করে। তবে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে সেটা হল মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ থেকে কোনো প্রতিনিধি আসেন নি, মধ্যপ্রদেশে IPTAর শিকড় খুব গভীরে প্রোথিত কিন্তু পাটনায় দেশের সবচেয়ে বড় প্রান্ত থেকে IPTAর অনুপস্থিতি লক্ষ্য করবার মত। এইরকম বম্বে, যেখানে IPTA সবচেয়ে সক্রিয়, আর যাদের অনুষ্ঠানগুলি দেশের মহানগরগুলিতে বড় বড় কোম্পানীদের সৌজন্যে অনুষ্ঠিত হয়, তারাও পাটনায় আসাটা উচিত বলে মনে করেনি। যদি তারা সেখানে আসত তাহলে বাস্তবিক অনেক কিছু শিখবার সুযোগ পেতে পারত। পাটনার এই নাট্যানুষ্ঠান একটা সত্যকে আবার তুলে ধরেছে যে মঞ্চাভিনীত নাটক এবং পথনাটকের ভেতর কোনো দ্বন্দ্ব নেই। □

[হিন্দি থেকে অনুবাদ ঃ 'অনার্য'। শামসুল ইসলাম নিশান্ত নাট্যমঞ্চের (দিল্লী) সংগঠক এবং দীর্ঘদিন ধরে গণসাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত।]

- অনার্য পত্রিকার গ্রাহক হোন।
- গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ঃ ২৮ টাকা।
- অনার্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন এবং লেখা পাঠান।

এই পৃথিবী একান্তই আমাদের

সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরী

স্বর্গীয় ঘোড়ায় চেপে কে পেরোয় মৃত্যুদুয়ার
কে পেরোয় জানি না
তবে কি-না যে পেরোয় সে আমি নই
আমি নই যে পেরোয় মৃত্যুদুয়ার সবুজ ঘোড়ায় চেপে

যে উপত্যকায় শুধু মৃত্যুরই নাম লেখা থাকে
দুর্গন্ধময় শবের হা-হা-কার লেখা থাকে
আর থাকে অযাচিত শেকলের ঝন্‌ঝনাৎ
কণ্ঠনালীগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিলেও
নীলচোখের তারাগুলোয় বিষ ঢেলে দিলেও
আমি সুপুরুষ অহংকারী মাতাল

আপাদমস্তক মদ গিলে
পাথরে কামড় দিয়ে এইখানেই ব'সে থাকবো ততদিন
যতদিন না আচমন সেরে মৃত্যু অথবা দুয়ার
দুয়ার অথবা মৃত্যু অথবা উভয়েই
নতজানু হয়ে ক্ষমাপ্রার্থী
এবং আগামী পরিবর্তনের দলিল-দস্তাবেজ
তুলে দ্যায় আমাদের হাতে □

শিকড়

অঞ্জন কর

ঘটনা কী ভাবে ছড়িয়ে যায় অন্য ঘটনায়
মাটি থেকে রস নিয়ে ব্যাপ্তি আনে ফুলের গৌরব
আমাকে অসীম ক'রে কাছে রাখে এই সব গ্লানি
মাঠের ফাটল জুড়ে মুখ ঢাকে রহস্যের খনি !

সে ভাবেই আছে প'ড়ে সুপুরি বনের ফাঁকে টিনের দোচালা
লাল দীঘি বড় গাঙ উথাল পাথাল সেই ঢেউ
কোথায় তখন যাত্রা সে বয়সে ভাবনার তা নয়
আমাদের পাশে ব'সে ছিল মেহের আলি খান !

ঘটনা কীভাবে ঘটে, ছড়ায় সে অন্য ঘটনায়
তখন আমার কত বয়স হবে, বছর চব্বিশ
অজ্ঞাত বাসের সেই অদ্ভুত রোমাঞ্চ নিয়ে আছি
বিদ্রোহ ছড়ানো রক্তে, মানুষ তো পদ্মার পাড়ের !

একবার যে ঘর ছাড়ে, তার প্রকাশ আকাশের মতো
আগুনের হুল্কা ওঠে, ঝল্‌কায় বিদ্যুৎ সবখানে
ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয় আক্ষরিক বন্দী যারা ঘরে
শৈশব মাতাল হ'য়ে ছুটে আসে, আলো অন্ধকারে। □

কবিতা—১

অমর পোদ্দার

বুকের আদল কতটুকু ধরা পড়ে ভাষায়—
অক্ষরে আর !—
বুক পেতেছি তাই ছুটে আসা
আগুনে-শিশের সামনে
যদি তাতে খুলে যায়
মানুষের জীবনের পাতাবাহারী স্বপ্নসাধ
প্রভাতি রঙে।

২

ভাবনা যদি শুধুই নিজের মধ্যে
ঘূর্ণীপাক খায়
আষ্টেপিষ্ঠে বর্তুল চৌহদ্দিতে পাক খায় শুধু—
না বাড়ায় হাত প্রতিবেশীর চত্তরে
এমন ভাবনায় কী বৃষ্টি ঝরে ?
ফসল ফলে কী মাঠে ? □

সেই স্বপ্ন

স্বাতী চট্টোপাধ্যায়

সেই একাকী পাহাড়ের উপর
ছোট্ট একটি কাঠের কুটীরে
ছাদ তার লাল টালি দিয়ে ঢাকা—
কিন্তু চাইনিজ ল্যাণ্টানের লতায় ছেয়ে গেছে।
পাহাড়ে রাত্রি নামে
অদ্ভুত অপার্থিব স্তব্ধতার রাত্রি
পাহাড়কে ঘিরে ঘিরে বয়ে যাওয়া
এক স্রোতস্বিনীর অস্পষ্ট কলধ্বনি—
নাঃ আপাতত এ ছবি বাতিল করেছি
বাতিল করেছি তোমার জন্য
একমাত্র তোমারই জন্য।
একমাত্র সেই তুমি যে ভালবাসে
মানুষের মাঝে থাকতে
মানুষকে জড়িয়ে থাকতে
একমাত্র সেই তুমি, যাকে জীবনের
সমস্ত সার্থকতা দিয়ে দেওয়া যায়
তাই একা থাকার অমন মনোরম ছবি—
রাত জেগে ধবধবে সাদা পাতায়
নীল কালিতে কবিতা লেখা—
একদম বাতিল।

আমার শ্রেষ্ঠ কবিতাই তো তুমি,
মানুষ॥ □

সে-আসে

শ্যামল মণ্ডল

তুমি চুপ করে শুনবে,
তার আসার শব্দ ?
সে আসে—আসে
সে চিরকাল আসে
প্রতিটি মুহূর্তে, প্রত্যেক বয়সে ; প্রতিদিন
এমনকি প্রতিটি রাত্রে সে আসে—আসে
সে চিরদিন আসে—
প্রতিটি গানে শুনি তার আসার শব্দ
তবুও প্রত্যেক দাবিতে সে জানায়
সে আসবে—আসবেই।
এপ্রিলে রৌদ্রের উত্তাপ (তাই)
বন পথে সে আসে,
বৃষ্টির ঝোর ধারে ; রাত্রি গভীরে
বিদ্যুৎ চমকানি, মেঘে ভাসে।
সে আসে—চিরদিন আসে
দুঃখের পর দুঃখে ভরা তার পথ
সে পেরিয়ে আসে ; সে আসে,
উজ্জ্বলতাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে
পৌঁছে সূর্য উঠার দেশে॥ □

নোবেল আমেরিকান সার্কাস

জুলফিকার মুসং

নোবেল আমেরিকান সার্কাস—পৃথিবীর বৃহত্তম সার্কাস। শোনা যায়—বিভিন্ন দেশের বাছাই বাছাই খেলোয়াড়, রিঙ মাষ্টার, লোকজন জীবজন্তু নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে এই সার্কাস। অর্থে আভিজাত্যে তুলনা নেই যার। সমাজ-তান্ত্রিক রাশিয়া ভেঙে যাওয়ায় সেখানকার পৃথিবীখ্যাত সার্কাসের লোকজনও এখানে যোগ দিয়ে এর গৌরব আরও বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে।

শহরের এদিকটায় লোকজন তেমন নাই একটি বস্তি ছাড়া। এখানে বিরাট মাঠ জুড়ে পড়েছে এদের তাঁবু। সার্কাস আসার দৌলতে অন্ধকার জায়গায় এখন আলোয় আলোময়, লোকজন দোকানপাটে সব সময় সরগরম। সকাল থেকে মধ্যরাত্র অবধি সার্কাসের মাইকে বিভিন্ন খেলা জীবজন্তুদের ফিরিস্তি দিয়ে ঘোষণা চলছে নানা ভাষায়। গানে বাজনায়, সাজন গোজনে অকাল বোধনে সেজে উঠেছে—বর্ষাকে হার মানিয়ে সারা শহর জুড়ে পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ। চলমান মাইকে ; টিভি, রেডিয়োতেও প্রচার চলছে নিয়মিত।

শিশু কিশোর-কিশোরী যুবক-যুবতী এমনকী বয়স্করাও আলোড়িত প্রচারে একবার না দেখলে নয়। হোটেল-রেস্তোরা চায়ের দোকান ঘরে-বাইরে সার্কাস, সার্কাস। দু একজন বৃদ্ধ কমলা সার্কাসের তুলনা দিতে যুবকরা দাবড়ে থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে—থামুনতো, কোথায় হরিদ্দার কোথায় গুহ্যদ্বার, কমলা সার্কাসের এতো টাকার ক্ষমতা ছিলো যে পৃথিবীর বাছাই বাছাই সব কে জড়ো করার? কি নেই সেখানে! গোটা আফ্রিকার জংগলটাই তুলে এনেছে এমন কি আমাদের সুন্দর বনের রয়েলবেংগল টাইগার, অবধি। আফ্রিকার সিংহ, গণ্ডার বাঘ ভাল্লুক, হরিন, শেয়াল, হায়েনা, পশু পাখী সব আছে। এমন কি গান-বাজনাও দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। মেয়েগুলো যানা, আহা! স্বর্গের পরী—খোলাও তেমন! দু একজন যুবক তো অনুকরণে দু একটা গানের সাথে অংগভঙ্গিই দেখিয়ে দেয়। দু একজন বৃদ্ধ বুঝে শুনে সেখান থেকে পিছটান

দিয়ে বেড়িয়ে আসেন। বৃদ্ধদের চলে যাওয়া দেখে নব্যযুবকরা হো-হো করে হেসে ওঠে ব্যাংগ বিদ্রুপে। বাছাই বাছাই কিছু লোককে তারা নিযুক্ত করেছে এরা এদের জীবজন্তু এবং সার্কাস পার্টির খাবার দাবার সংগ্রহের। সামিল বিভিন্ন ক্লাব এবং বেকার যুবকরা—ভাগ করে দিয়েছে কাজের। যার বিনিময়ে বেশ ভালই কামাচ্ছে এরা। আসছে গাড়ি গাড়ি হাতির খাদ্য গাঁগঞ্জ থেকে বাগান উজাড় করে কলাগাছ, বট গাছ, ঘাস। এনে ফেললেই নগদ নারায়ণ।

যদিও এতে কলার দাম বেড়ে গেছে। ছাগল গরুর জন্যে সবুজ ঘাসে আর স্থানীয়রা হাত দিতে পারছে না। এমন কি মানুষের খাবার জিনিষেরও। বস্তীবাসীরা পড়েছে আরও বিপদে। অনেকেই লাগোয়া এলাকায় চাষবাস করে। সার্কাসের হাতি এদের বাড়ির কলাগাছ, জমির ফসল নষ্ট করে মাঝে মধ্যে। বলতে গেলে বিদেশী ভাষায় কি যে ওরা বলে বুঝতেও পারে না ঃ অথচ দিনের পর দিন এদের সামান্য আয় রোজগারের জায়গা জমিও নষ্ট হচ্ছে। সার্কাসপার্টি যে সব লোক নিযুক্ত করেছে—এরা সবাই রাজনৈতিক দলের আশ্রয়পুষ্ট। পুলিশ-প্রসাশনও এদের হাতের মুঠোয়। বেশী কিছু বলাও দায়! বিষ নজরে পড়লে আর রক্ষে নেই। আজ মুরগী নাই, কাল ছাগল-খাসী নেই। এখন হয়েছে আরেক বিপদ—এদের হাত থেকে রক্ষা করতে যারা এগিয়ে যেতো সজাগ রাখতো বাড়ির লোকজনকে সেই কুকুরগুলোও ধরে নিয়ে যাচ্ছে। একটি কুকুর দিতে পারলেই একশো টাকা দিচ্ছে সার্কাস পার্টি। তাই সার্কাসের জন্যে কুকুর সংগ্রহের ধুম পড়ে গেছে। ধনী এলাকায় আর এখন তেমন দেশী কুকুর দেখা যায় না। বাড়িতে বাড়িতে যে সব পোষা হয় সে সবই ইউরোপিয়ান কুকুর। এদের পিছনে যা খরচা তাতে একটা সাধারণ পরিবারের খাওয়াদাওয়া সংসার চলে যেতে পারে। সে সব কুকুর তো ধরা যায় না, ধরা যায় দেশী বেওয়ারিস কুকুর যা আইন মেনে পোষা হয় না। ওদের গলায় থাকে না বেল্ট বা শেকল! ধনী এলাকা থেকে ডাস্টবিন বিদায় নিয়েছে। চালু হয়েছে পলি প্যাক। পলি প্যাকে নোংরা আবর্জনা ভর্তি করে রাখে বাড়ির ভেতরই, কর্পোরেশনের লোক ওগুলো সময়ান্তরে নিয়ে যায়। পরিবেশ বাঁচে রাস্তাঘাট ঝকঝকে থাকে। ডাস্টবিন থাকলে এ সব দেশী কুকুর ঘোরেফেরে—বিদেশীরা এ সব দেখলে এদেশে পুঁজি ঢালা বন্ধ করে দিতে পারে। তাতে আমাদের শিল্পনীতি মার খাবে—দেশ এগুতে পারবে না। আর এ সব কুকুর আরও সাংঘাতিক। ইউরোপিয়ান

কুকুরের মতো সাংস্কৃতিক শিক্ষা দীক্ষাও কম—ধনীদের নানা ছাটফাট, রঙঢঙের পোষাক-আসাক ভাবভঙ্গিতে কীসের গন্ধ পায় কে জানে—দেখলেই তেড়ে যায় সেদিকে ঘেঁও ঘেঁও করতে করতে। যা অসহনীয়। ধনীদের। বিদেশীদের কাছে লজ্জারও ব্যাপার। অতীতে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে কুকুর ধরা অভিযান চলেছিলো কিন্তু সরকারের এতো খরচ তারপর যদি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে তেমন অর্থ সাহায্য পাওয়া যেতো তবে না হয় চালানো যেতো। যেহেতু তা পাওয়া যায় নি তাই বন্ধ রাখা হয়। তারপর এদের বংশ নাশ করতে নির্বিন্ধ-করন কর্মসূচী নেয়া হয়েছিলো সেও ঐ কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহযোগিতার অভাবে পরিত্যক্ত হয়। কুকুরগুলোর এখন আশ্রয়স্থল হয়েছে বস্তি এলাকায়। এখানেই যা সামান্য খাবার টাবার এবং থাকার জায়গা মেলে। আর এখানে লোকের সাথে এদের বাচা-মরার মিল অমিল অনেকটাই। এরা আদরও করে নিজেরা খেতে পেলে দুমুঠো দেয়ও। আবার কপাটশূন্য ঘরদোরে ঢুকে একটু-আধটু জোটে। তাই কুকুরগুলোও এই সব গৃহস্বামীদের অবর্তমানে বাড়িঘর দোরও দেখে।

আজকে বস্তিবাসীদেরও অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি কুকুরগুলোর তথৈ অবস্থা। কুকুর ধরাতে বাধা দিতে গিয়ে—বস্তিবাসীরা অনেক আইনি জ্ঞান আহরণ করে কমিশনার তথা চেয়ারম্যানদের থেকে—পুলিশও শাষিয়ে গেছে কুকুর ধরা অভিযানে বাধা দিলে হাজতবাস আর ডান্ডা খেতে হবে। সরকারী নির্দেশ। যা একসময় সরকার টাকার অভাবে করতে পারেনি—আমেরিকা যদি সেই কাজটি করে দেয়—তবে শহর থাকে পরিস্কার। বেওয়ারিশ কুকুরগুলোর অত্যাচার থেকে নগরবাসী সুস্থ থাকে। আর তাই-ই শুধু নয় প্রতি কুকুর পিছু একশো টাকা এতে আমাদের বেকারদেরও কাজ মিলছে। এ সুযোগের ব্যাগড়বাই দিলে তারা দেশের শত্রু। সুতরাং বস্তিবাসীদের কথা টেকে না। এনারা গন্যমান্য শিক্ষিত ভদ্রজন। শেষ চেষ্টা করেছিলো এরা—পোষা কুকুরকে ধরবে তা বলে!—অভিযোগে কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্গের হাসি হাসে—কী খেতে দাও কুকুরকে? আর তারা রাস্তায় বের হয় কেন! শেকল, কিংবা বেল্ট পরানো থাকে কী কুকুরের গলায়? ঠিক যেমন ধনীরা তাদের কুকুরদের রাখেন!

কী উত্তর দেবে বস্তিবাসী যাদের নিজেদেরই খাবার যোগাড় অনিয়মিত, তেমনই বাসস্থান। আরও ঘাবড়ে যায় এতদঅঞ্চলে বাস করতে হলে

মিউনিসিপ্যালিটি এ্যাক্ট মেনে চলতে হবে সেদিক থেকে তোমাদের সবই বেআইনি বাস। ব্যাস মোক্ষম আঘাত। আর রা কাড়তে পারে না গরীবগুর্বোগুলো। কী আর করে, কুকুরগুলোকে ধরা কালিন কী তাদের আর্তি দেখা ছাড়া তাদের এই মুহূর্তে কিছুই করার থাকে না।

ন্যাড়া মন্ডলের বড় আদরের কুকুরটাকে মাস্তানরা সেদিন ঘরের ভিতর ঢুকে পাকড়াও করলো। এদের বালবাচ্চা নেই। কুকুরটাকেই সন্তানের মত আগলে রাখতো। কুকুর ধরা নিয়ে ন্যাড়ামন্ডলের আর তার স্ত্রীর সাথে বসচা হয়েছিলো খুব, মাস্তানরা তবুও ছাড়েনি এমন কী ন্যাড়ামন্ডলের স্ত্রীর হাতে পায়ে ধরেছিলো তবুও না। বরং শাষিয়ে গেছে এদের কাজে বাধা দিলে—বাস উঠিয়ে দেবে। সেই থেকে এদের খাওয়া দাওয়া উঠে গেছে। এমন ঘটনা অনেক। এই ঘটনার পর থেকে ন্যাড়া মন্ডলের বাড়িতে শোকের অন্ধকার খাওয়া দাওয়া বন্ধ। এদের সন্তানকে সিংহ বাঘের মুখে তুলে দেওয়ার কথা চিন্তা কোরে থম মেরে গেছে।

(২)

সেদিন এলাকায়—সিংহের গর্জনে তার সাথে বাঘ অন্যান্য জীবজন্তুর চিৎকার হুংকারে এলাকায় ত্রাসের সঞ্চার হলো! সবাই ছুটলো সার্কাস পার্টির তাবুর দিকে। সেখানে গিয়ে দেখা গেলো সিংহের খাঁচার চারদিকে বন্দুক উচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সার্কাসের লোকজন, ভিতরে সিংহ গজরাচ্ছে যেন লোহার খাঁচা এই ভাঙে কি সেই ভাঙে। সার্কাসের লোকজন জড়ো হয়ে ঘিরে আছে সেখানে তার সাথে পাবলিক। পাবলিককে হটাতে পুলিশ এসে গেছে। তারা লাঠি বন্দুক উচিয়ে তাড়া করছে সাধারণ মানুষকে, ওদিকে মাইকে ঘোষণা চলছে—অনিবার্য কারণে, আজকে প্রদর্শনী বন্ধ থাকবে। জানা গেলো একটি কুকুর একটা সিংহের বাচ্চাকে মেরে ফেলেছে এবং মা সিংহকেও ক্ষত বিক্ষত করেছে। যদিও শেষ পর্যন্ত তাকে সিংহের পেটে যেতেই হয়েছে। কিন্তু সিংহ তার শাবক হারানো শোকে হুং-হুংকারে এলাকা মাথায় তুলেছে। তার সাথে সাথে অন্যান্য পশুরাজও কেননা যাদের জ্যান্ত কুকুর খাবার হিসেবে দেয়া হোত এই ঘটনায় আজকে ম্যানেজারের হুকুমে সেটি বন্ধ রাখা হয়েছে। মালিককে খবর পাঠানো হয়েছে, তিনি থাকছেন এখানকার ফাইভস্টার হোটেলে। সাধারণত তিনি সার্কাস

পার্টির সাথে ঘোরেন না। কিন্তু গ্লোবালাইজ ওয়ার্লডের কল্যাণে তৃতীয় বিশ্বের দেশ ঘুরে দেখছেন যদি নতুন কোন শিল্প গড়ে তোলা যায়। তিনি যখন ফোনে খবরটি শুনেছিলেন তখন এলাকার ডাকসাইটে এক শিল্পপতির সাথে এ বিষয়ে আলোচনা চলছিলো। মিঃ ম্যাক রাগে শোকে তখনই হোটেল থেকে তার অ্যামেরিকার—বহু মূল্যবান মোটরগাড়ি চেপে চলে এলেন সার্কাস স্পটে—ম্যাকের ডিয়ার লায়নের childকে খতম করেছে ব্ল্যাকনেটিভ ডগ্। বিশ্বাস হচ্ছিলো না। সরেজমিনে এসে সব শুনে দেখে লাল রক্ত আরও বোধ করি লাল হোয়ে উঠলো ম্যাকের চোখ মুখ তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তার অফিস তাবুত গিয়ে দামী মদের বোতল খুললেন—দ্রুত কয়েক পেগ ঢেলে দিলেন গলায়। তারপর তাকালেন ম্যানেজার মিঃ অর্জুন সিংহের দিকে। মিঃ অর্জুন মালিকের এ মূর্তি দেখেনি পূর্বে—তাই ভেতরে ভেতরে ভিতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। কি জানি সাহেব-সুবো মানুষ এখনই তার বহু দামী চাকরিটি 'নট' করে দেন কিনা।

এই যে ব্লাডি ব্ল্যাকনেটিভ সিং—চাবুকের মতো গিয়ে আছড়ে পড়লো মিঃ অর্জুন সিংহের উপর।

—ইয়েস স্যার।

—তোমাকে বলেছিলাম আমার ডিয়ার সিংহ এবং তার চাইল্ডের উপড় স্পেশাল কেয়ার রাখতে—

—ইয়েস স্যার আমি রেখেছিলাম। কিন্তু—

—কিন্তু কী? জান আমার ডলার লস হলো। মিঃ ম্যাক টেবিল থেকে আরও কয়েক পেগ গলায় ঢেলে চিৎকার করে উঠলো—এ্যানসার দিচ্ছ না যে—ধমকে ওঠে মিঃ ম্যাক।

যদি স্পেসাল কেয়ারই রাখবে তবে এমন ইনসিডেন্ট ঘটল কী করে?

—স্যার এটা একটা একসিডেন্ট। আমার কিছু করার ছিলো না এমন সাডেনলি ঘটলো।

—স্টপ ইট। আমি অনেক আশা নিয়ে তোমাকে রিক্রুট করেছিলাম। আই মিন ভেবেছিলাম তুমি তোমার কানট্রির নাড়িনক্ষত্র সব জানো চেনো সেই মতো তুমি কাজ করবে। আমি এও বলেছিলাম মন দিয়ে কাজ করলে তোমার ফিউচার খুলে যাবে বাট ব্লাডি ব্ল্যাকনেটিভ তুমি আমার সর্বনাশ

তুমি বিট্রে করলে কে বিশ্বাস করবে—একটা হাংরী স্কেলিটন ব্ল্যাকনেটিভ ডগ আফ্রিক্যান লায়নকে উনডেড করে তার চাইল্ডকে কিল করবে। আই মিন ইট ইজ কন্সপেরেসি। ইউ আর অল বিট্রেয়ার। নেটিভ দ্য ক্রিমিন্যাল এন্ড অলসো কন্সপাইরার।

—না স্যার বিশ্বাস করুন। এটা কনসপিরেসি নয়। আমি বিট্রেয়ার নই।

সাট আপ—ইডিয়েট। এ ইনসিডেন্ট ঘটলো কী করে। তুমি ইনকোয়ারি করেছো। গিভ মি রিপোর্ট—হাউ হট ইজ পসিবল। আসলে এই সব নেটিভ ডগ জন্ম মুহূর্ত থেকেই খেতে পায় না। আগে তবুও রিচ্ এরিয়ায় ডাষ্টবিন ঘেটে তবুও যা হোক খাবার মিলতো এখন তো সে সব ডাষ্টবিন তুলে দেয়া হয়েছে, এখন বস্তিতে আশ্রয় হয়েছে, ঐ বস্তিতে বস্তিবাসীরা তবুও কিছু খাবার দাবার দেয় বাসী মলমূত্র খায়। বস্তিবাসীর মতোই জন্ম ওদের চাইল্ডের সাথেই বড় হয়। ওরাও খেতে পায় না কুকুরগুলো আর কতটুকু পাবে।

আমরা কুকুরগুলোকে এনে নন্‌পয়জনড্ করার জন্যে তিনচার দিন না খাইয়ে রাখতাম যাতে যে সব দূষিত জিনিষপত্র খায় হজম হয়ে পায়খানা পেচ্ছাব হয়ে বের হয়ে যায়। আমরা ইনজেকশন দিতাম দূষণমুক্ত করতে, তারপর জ্যান্ত ফেলে দিতাম বাঘ সিংহের খাঁচায়। আসলে মানুষের মতোই ক্ষুধার্ত হলে যা হবার—মরিয়া হয়ে ওঠে। ঠিক সিংহর ঘটনাটা তদ্রূব। আসলে জ্যান্ত না দিয়ে যদি কেটে দেয়া হোত—

—নো জ্যান্তই দিতে হবে। এতে ওদের খাবারের তৃপ্তি হয় একসারসাইজ হয়, ন্যাচারাল ফিল করে—গ্রোথ ঠিক থাকে।

—কিন্তু এ ঘটনার পর তো অরে জ্যান্ত কুকুর দেয়া যাবে না তাতে—

—তবে আর কী, জ্যান্ত কাউ দাও।

—কিন্তু তাতে আমাদের অনেক খরচ বেশী হবে স্যার।

—হোক তা বলে তো আমার জীবন্ত সম্পদ হারাতে পারি না।

—কয়েক শো কুকুর স্যার মজুত আছে ওগুলোর কী হবে। বাঘ সিংহ বাদে অন্য জন্তুদের তবে কেটে দি—

—নো, নো, ডগগুলোর মুখগুলোকে তার দিয়ে বেঁধে দাও। হাত পাগুলোও। তাতে যদিও ন্যাচারাল শিকার করে খাওয়ার আনন্দ কম হবে—

কী আর করা!

—অল রাইট। কিন্তু সিংহ বাঘগুলোকে।

—ওদের জন্যে গরুর ব্যবস্থা করো, আর হ্যা, গরুগুলোকে সিং ভেঙে দেবে যাতে ওরা আর কোনও কনসপিরেসি করতে না পারে। এ দেশের জীবজন্তু যেমন, মানুষগুলোও—পোষ মানতে চায় না, ল' এন্ড অর্ডার ক্যারি করতে চায় না—ব্ল্যাক নেটিভ ফিল্ড। বাট আমরা এদের সহবত শিখিয়ে দেবো। নো ওদের খাবার ব্যবস্থা করো।

—কিন্তু স্যার—চারিদিকে রাম হনুমান পার্টির যেভাবে উত্থান তাতে গরু দিচ্ছেন—ওরা যদি কোনও গণ্ডগোল বাধায় তবে আমাদের বিজনেসের ক্ষতি হবে।

—নো, নো বিজনেসের ক্ষতি হবে না বরং ভালো হবে। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ম্যানেজারি করবে? ইউ, আর এ ফুল—লাগাক না ওরা হল্লা, হল্লা তুললে অপর পক্ষ ধর্মীয় উন্মাদনায় আরও বেশী বেশী সার্কাস দেখবে। আর সে প্রচার করবে ওই ধর্মীয় লোকেরাই। এর মধ্যে হল্লাকারীদের ডেকে বিষয়টা বুঝিয়ে দেবো—কথা কটি বলেই ড্রয়ার থেকে এক বান্ডিল টাকার নোট নাচিয়ে নাচিয়ে বললেন ডু ইউ আন্ডার স্ট্যান্ড, এতে সবাই বাঁধা দেখছো না সব লিডাররাই আমেরিকায় কেন যায়! এ পক্ষের ট্যাক যখন ফাঁকা হয়ে যাবে নেতাদের ইঙ্গিত করতেই আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্র করবে। আমরা তখন গরু দেয়া বন্ধ করবো তার বদলে বিয়ার আই মিন শুয়োর দেবো—তখন শুয়োর পক্ষীয়রা দলে দলে আসবে জয়ের আনন্দে—

—কিন্তু যদি এতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগে যায়?

—ও ইয়েস্‌ম্যান ইউ আর রিয়ালি ফুল—এতে ভাবার কী আছে—তাতেও আমাদের মংগল হবে, দেখছো না মুক্ত অর্থনীতির দৌলতে তোমাদের ডানবাম প্রতিক্রিয়াশীল সবাই কেমন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে আমাদের দেশে। আমাদের প্রত্যক্ষ পরোক্ষে কেমন হেলপ করছে। আর, ও ইয়েস তোমাকে বলা হয়নি—তোমাদের নামকরা শিল্পপতি মিঃ বাজোরিয়ার সাথে কথা হয়েছে এই এলাকা আমার চয়েজ হয়েছে আমি এখানে যৌথ শিল্প গড়বো। এখানকার কর্তৃপক্ষও খুব উৎসাহী। সুতরাং দাঙ্গা যদি বাধেই তবে এই বস্তিতে হিন্দু মুসলমান আছে। তাদের একতা ভাঙবে সেই সুযোগে—গলা ফাটানো হাসি হাসতে

থাকলো মিঃ ম্যাক। তার হাসির সাথে যোগ দিলেন অর্জুনও। তবে ভিতরে ভিতরে ভয় একটাই সম্মুখ সমরে তো তাদেরই পাঠাবে এরা—ভাবনায় ছেদ পড়ল ম্যাকের নির্দেশে—যাও ইয়েস্‌ম্যান মন দিয়ে কাজ করো। মিঃ অর্জুন সাহেবকে থ্যাংকস জানিয়ে চলে আসে কর্মক্ষেত্রে! মনে মনে প্রত্যাশা মিঃ ম্যাক ইনডাস্ট্রি গড়লে—সেই হবে ম্যানেজার সুতরাং তাকে সিনসিয়ারলি কাজ করতে হবে।

(৩)

এদিকে ন্যাড়া মন্ডল আর তার স্ত্রীর মনে মনে খুশী খুব তারা যা পারেনি ককুর তাই পারলো। সাহেবের সিংহ খতম হলো। কুকুরকে আর খাবার হিসেবে হিংস্র জানোয়ারদের দেওয়া হবে না।

গুটি গুটি দুজনা দেখতে এলো তামাশা। কিন্তু এসে স্বচক্ষে যা দেখলো কুকুরগুলোকে লম্বা লম্বা সাড়াশী দিয়ে ধরে মুখগুলোকে তার দিয়ে বাধা হচ্ছে। বাধা হচ্ছে পা গুলোকেও ওদের ছটফটানি দেখে দুজনের ভেতরটা রাগে দুঃখে জ্বলতে লাগলো। ফিরে আসার পথে আরও জানতে পারলো তাদের বস্তি উচ্ছেদ করে ওখানে কি শিল্প গড়বে—রাগে দুঃখে ফুঁসে উঠে বলল দাঁত থাকতে তো আমরা দাঁতের দাম বুঝি না আজকে কুকুর নিচ্ছে কালকে মানুষ নেবে। বুড়ি বলল—যদি থাকতো সেইগুলো যারা বলত এ আজাদী ঝুটা হ্যায়। ……তরতাজা ছেলেগুলোকে কিভাবেই না খুন করলো;

বুড়ো বলে—কে বলেছে ওরা শেষ হয়ে গেছে ওরা সূর্যসেন, ক্ষুদিরামের দল ওরা মরে না দেখবি সময়মতো ওরাই দাঁড়াবে—ওরা গোপনে গোপনে বেড়ে উঠছে—কোন অন্যায় চিরদিন থাকে না। চ' পা চালিয়ে চ' আকাশে দেখ কী মেঘ করেছে এখনই ঝড় বৃষ্টি আসবে।

বুড়ি বিড়বিড় করে, আসুক ঝড় পোড়ামুখোদের সব উড়িয়ে নিয়ে যাক মর মর—পোড়ামুখোরা মর… … … □

মাইকেলের চোখে রাম আগ্রাসী আর্য প্রতিভূ

সোমেশ দাশগুপ্ত

যদিও মাইকেল-এর মেঘনাদ বধ কাব্য বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস-এর পরে প্রকাশিত, তথাপি মাইকেলের আলোচনা এ নিবন্ধে আগেই আসবে। কারণ সীতার বনবাস—আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়, দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ।

মেঘনাদ বধ কাব্যে মাইকেল রাক্ষসরাজ রাবণকে সর্বগুণমণ্ডিত করে, তুলনামূলকভাবে অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রকে আপাতঃদৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা দিতে অস্বীকার করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে, বাল্মীকির রামায়ণ কাহিনীকে ভিত্তি করেই মাইকেল মধুসূদন তাঁর এই অবিস্মরণীয় কাব্যে সেকালের ইতিকথাকে নূতন করে, একালের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পাঠক সমীপে উপস্থিত করেন। কেন মাইকেল চিরাচরিত পথে না গিয়ে মেঘনাদ বধ কাব্যে রামায়ণের এক নূতন পাঠ উপস্থিত করলেন, এর পশ্চাদপট অনুসন্ধান আমাদের সাহিত্য আলোচনা ক্ষেত্রে এযাবৎকাল লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত।

আমাদের সামনে বাস্তবে যা আজও রয়ে গেছে, তা হল মধুর নিজের লেখা চিঠির অংশ ঃ

"People here grumble and say that the heart of the poet in 'Meghnad' is with Rakshasas. And that is the real truth. I despise Ram and his rabble; but the idea of Ravan elevates and kindles my imagination ; he was a grand fellow"

(মধুসূদনের পত্রাংশ-রচনাবলী-সাহিত্য সংসদ)

উত্তর ভারত দখলকারী আর্যদের প্রতিনিধি রামচন্দ্রের অপেক্ষা, অধিকতর পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিলেন মাইকেল ভারতবর্ষের অনার্য আদিবাসী লঙ্কারাজ রাবণকে।

মাইকেলের পক্ষে তখনকার দিনে আজকের মতো রামায়ণের যুদ্ধের সম্ভাব্য ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি জানতেন না যে, বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে, বহিরাগত আর্যদের প্রতিভূ শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন উন্নততর কৃষি সভ্যতার প্রতিনিধি (রাজা জনক প্রসঙ্গ স্মরণীয়)। পক্ষান্তরে রামায়ণ বর্ণিত বানররাজ বালি এবং রাক্ষসরাজ রাবণ ছিলেন যথাক্রমে কৃষি পূর্ববর্তী বনচারী সমাজ ও পশুচারী সমাজের প্রতিনিধি।

মাইকেলের সামনে ইতিহাসের এই ব্যাখ্যা ছিল না যে, উন্নততর সভ্যতার যে স্বাভাবিক, অতিরিক্ত সুবিধা, তাই নিয়ে আর্য প্রতিনিধি শ্রীরামচন্দ্র সংগ্রামে নেমেছিলেন, অপেক্ষাকৃত পশ্চাদপদ দুই দ্রাবিড় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে।

আর্যদের যানবাহন যুদ্ধাস্ত্রও ছিল উন্নততর। দ্রুতগামী অশ্বচালিত রথ নিয়ে শ্লথগতি হস্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে, প্রধানত ধনুর্ধারী সেনাবাহিনী নিয়ে মুষলগদা প্রধান রাক্ষস বাহিনীর বিরুদ্ধে ; কূটনীতি নিয়ে (বিভীষণকে রাজসিংহাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাবণের বিরুদ্ধে ; বিশ্বাসঘাতকতায় প্ররোচিত করে) সরলতার বিরুদ্ধে, রামচন্দ্রের জয় ঐতিহাসিক ভাবেই অবশ্যম্ভাবী ছিল।

মাইকেল শুধু এইটুকু জানতেন যে, তাঁকে এমন একটি কাব্য রচনা করতে হবে, যা দিয়ে তিনি স্থবির বাঙালীর অন্ধতা, কুসংস্কার, জড়তা ও নিষ্ক্রিয়তাকে একটা বিরাট ধাক্কা দিতে পারবেন। হাজার হাজার বছরের প্রচলিত ধ্যানধারণাকে মধুসূদন এক ধাক্কায় নড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন এবং তা পেরেও ছিলেন।

পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষিত বাঙালী মাইকেলের এই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে এক ঐতিহাসিক উপমা খুঁজে পেয়েছেন।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় বণিক পুঁজিপতিশ্রেণী ভারত তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে। ভারতে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ফরাসী এবং ইংরাজ আদি আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অভিযান ও সশস্ত্র দখলদারীর শুরুর দিকে দেখা যায়—আগে আগে চলেছেন বাইবেল হাতে খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা, পিছে পিছে বন্দুক হাতে শ্বেতাঙ্গ সেনানী।

প্রাচ্যের 'অশিক্ষিত হীদেন'-দের 'অন্ধকার হইতে আলোর পথে' নিয়ে আসার এক গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে এদেশে ঐ খৃষ্টান ধর্মযাজকেরা এসেছিলেন পিছনে সাম্রাজ্যবাদী গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে। তারই ফলশ্রুতিতে পরবর্তী দুই শতাব্দী ধরে ভারত ছিল ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপনিবেশ।

ভারতে যেমন পরপর পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজরা এলেও, শেষ পর্যন্ত টিকে গেল ইংরাজ, তেমনি সুমাত্রা-যবদ্বীপ-বলিদ্বীপে ওলন্দাজরা, শ্যাম-কম্বোজ-ইন্দোচীনে ফরাসীরা, লাতিন আমেরিকায় স্পেনীয় ও পর্তুগীজরা ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল দুই শতক কাল।

আজ মনে হয়, মাইকেল তাঁর সমকালীন পটভূমিকায় ফেলে তিন হাজার বছর আগেকার এক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে গেছেন। সেদিনকার বহিরাগত আর্যদের সঙ্গে মাইকেল তাঁর সমকালীন ইংরাজ অভিযানকারীদের সাদৃশ্য ও সমতা খুঁজে পেয়েছেন। আর, শ্রীরামচন্দ্রের নেতৃত্বে আর্যবাহিনীর দাক্ষিণাত্য অভিযানের আগে আগে যে বৈদিক ঋষিকুল বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে আশ্রম স্থাপন করেন এবং (বাল্মীকির রামায়ণ অনুযায়ী) রাম লক্ষ্মণকে অনার্য বধে প্ররোচিত করেন, সেই বেদজ্ঞ মুনিঋষিদের সঙ্গে তুলনা খুঁজে পান আধুনিক খ্রিষ্টান মিশনারীদের।

এই ধরনের ব্যাখ্যা ব্যক্তি মধুসূদনের দর্শন সম্পর্কে কতখানি প্রযোজ্য তা অনুমান করা কঠিন। কিন্তু মধুসূদনের ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস থেকে আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত করার মতো কিছু তথ্য ও ঘটনা বিচার করে দেখতে পারি।

প্রথম যৌবনের রোমান্টিক মানসিকতা নিয়ে হিন্দুত্ব থেকে খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে গিয়ে মধুসূদনের কিছুটা মোহভঙ্গ ঘটে। মধুসূদন ধর্মান্তর গ্রহণের পর সাহেবদের কাছ থেকে যে সুযোগ সুবিধা প্রত্যাশা করেছিলেন, তা বহুলাংশেই অপূরিত থাকে। ফলে, মাইকেলের অন্তরে ইংরাজদের বিরুদ্ধে নীরব ক্ষোভ থাকা কিছু অস্বাভাবিক ছিল না। এ থেকে কেউ কেউ ভাবতেও পারেন, ধর্মান্তরের মোহভঙ্গে পীড়িত মাইকেল সর্বশ্রেণীর ধর্মযাজকদের সম্বন্ধেই কিছুটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। রামায়ণের মুনিদের সম্পর্কেও।

উনিশ বছর বয়সে ইংলন্ড গমনেচ্ছু মধু খ্রিষ্ট ধর্ম পরিগ্রহণের সংকল্প নেন। পিতা রাজনারায়ণ দত্তের লেঠেলদের হাত এড়াতে তিনি ফোর্ট উইলিয়ামে আশ্রয় নেন। ১৮৪৩ এর ৯ ফেব্রুয়ারী মিশন রো-এর ওলড্ মিশন চার্চে আর্চডিকন ডিয়ালট্রি তাঁকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষা দেন।

হিন্দু ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত 'হিন্দু কলেজ'-এ পড়া বন্ধ হওয়ায় মধুসূদন শিবপুর বিশপ্স কলেজে ভর্তি হন। বিশপ্স কলেজে য়ুরোপীয় ছাত্রদের

সঙ্গে ভারতীয় ছাত্রদের সহবাসের ফলে নানা ধরণের সমস্যা দেখা দিত। ধর্ম-যাজক কর্তৃপক্ষের 'অগণতান্ত্রিক আচরণ' মধুকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। আহার্য বিষয়ে বৈষম্য এবং পোষাক পরিচ্ছদ সংক্রান্ত বিধিনিষেধও তাঁকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত মধুসূদন রচনা সংগ্রহ থেকে জানা যায়, এইসব বৈষম্য ও বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়ে খাবার টেবিলে গেলাস ভাঙ্গেন তিনি। পরবর্তীকালে এই বিক্ষোভ মনের মধ্যে অবদমিত ভাবে জমে ছিল, এবং তা ইংরাজ বিরোধিতার জন্মও দিয়েছিল।

এ ছাড়া, ১৮৪৯-এ মাদ্রাজ থেকে বন্ধু গৌরদাস বসাককে লেখা এক চিঠিতে মাইকেল তাঁকে কাশীরাম দাসের মহাভারত এবং রামায়ণের শ্রীরামপুর সংস্করণ পাঠাতে বলেন। এটা তাঁর নিজের দিক থেকে ভারতীয় মহাকাব্যের প্রতি মুখ ফেরানোর একটি পজিটিভ পদক্ষেপ।

আবার, মাদ্রাজ থাকাকালীন আরেকটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য—যেটাতে মাইকেল দ্বিতীয়বার জাতিগত বৈষম্যের শিকার হন! ১৮৫২—৫৬ সময়কালে মাইকেল মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত বিদ্যালয় বিভাগে সেকেন্ড মাস্টার ছিলেন। প্রথানুযায়ী তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ বিভাগেও ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হতে পারতেন (সূত্র ঃ সংসদ রচনাবলী)। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয়কে ইংরাজরা এ সম্মান থেকে বঞ্চিত করেন। এই নিয়ে মধুসূদনের মনে শ্বেতাঙ্গ আর্যদের প্রতি ক্ষোভ ঘণীভূত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক!

তথাপি, উপরিউক্ত ঘটনা থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে, মাইকেলের অন্তরের অবরুদ্ধ ক্ষোভই তাঁকে বহিরাগত আর্যদের হীন করে দেখাতে প্ররোচিত করেছিল। অবশ্যই সেটা হবে অতিসরলীকৃত ব্যাখ্যা।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে, দুটি ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। যদিও এই দুটি ঘটনাই মেঘনাদ বধ কাব্য (১৮৬০—৬১) রচনার তিন বৎসর পরের ঘটনা (১৮৬৪), তথাপি এ দুটি উল্লেখযোগ্য। কারণ এ ঘটনাগুলির মধ্য থেকে মধুসূদনের জন্মভূমির প্রতি মমত্ববোধ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভার্সাই থেকে গৌরদাস বসাককে লেখা দুটি চিঠির অংশ ঃ

"Here, you are the master of your masters! The man that stands behind my chair when I dine, would look down upon the best of our princes in India. The girl that pulls

off my muddy boots on a wet day, would scorn to touch our richest Raja in India."

(এখানে এসে তুমি তোমার (ইংরাজ) প্রভুদের প্রভু হতে পারবে। যে শ্বেতাঙ্গটি আমার খাওয়ার সময় আমার পিছনে খাঁড়া হাজির থাকে, ভারতবর্ষে গিয়ে সেই ব্যক্তিই আমাদের বড় বড় মহারাজাকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখবে। বর্ষার দিনে এখানে যে শ্বেতাঙ্গ মেয়েটি আমার কর্দমাক্ত জুতা খুলে দেয়, সেই মেয়েই ভারতে গেলে সর্বাপেক্ষা ধনী দেশীয় রাজাটিকেও ঘৃণার চোখে দেখবে।)

সামান্য দুজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ মধুসূদনকে সেবা করছে দেখে তাঁর কিশোর সুলভ আনন্দ উচ্ছাস তাঁর অন্তর নিহিত স্বদেশ প্রেমেরই প্রকাশ !

আরেকটি চিঠিতে ইংরাজী সংবাদপত্রে ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণে মাইকেলের বিক্ষোভ লক্ষণীয়। ১৮৬৪-র পাঁচই অক্টোবর দক্ষিণবঙ্গে এক বিধ্বংসী ঝড়ে বহু প্রাণ ও সম্পত্তি ধ্বংস হয়, কিন্তু বিলাতের সংবাদপত্রগুলিতে কলকাতার সাহেব পাড়ার ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ থাকলেও, 'the Calcutta papers, as a matter of course, dwell more particularly on the European side of dismal picture and pass over the native portion with a slight glance of apathy. The English papers (বিলাতের) followed suit."

(কলকাতার কাগজগুলো ঝড়ের বিবরণ দিতে গিয়ে প্রধানতঃ সাহেবী এলাকাগুলির ক্ষয়ক্ষতিরই বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে, আর ভারতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির কথা দায়সারা ভাবে লিখেছে। বিলাতের কাগজগুলিও তাই অনুসরণ করেছে।) এক্ষেত্রে ইংরাজদের প্রতি মাইকেলের ক্ষোভ সঙ্গত।

মেঘনাদ বধ কাব্য লেখার পিছনে আরও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। গৌরদাস বসাক মারফৎ মধুসূদন তাঁর Captive Lady-র একটি কপি কলকাতায় বেথুনের কাছে পাঠান। বেথুন তখন সরকারী শিক্ষাসচিব।

ক্যাপটিভ লেডী প'ড়ে বেথুন সাহেব মধুকে বাংলা কাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ হ'তে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বেথুন গৌরদাসকে লিখেছিলেন ঃ

"As an occasional exercise and proof of his proficiency in the language, such specimens may be allowed. But he (Madhusudan) could render far greater service to his country

and have better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents, which he has cultivated by his study of English, in improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language..."

(বেথুন লিখেছেন ঃ মাঝে মাঝে ইংরাজী সাহিত্যে তার দখল ও দক্ষতা দেখাতে মধু এরকম দুই একটি লেখা লিখতে পারে। কিন্তু, সে তার দেশকে অনেক বেশী দিতে পারবে, একটা দীর্ঘস্থায়ী খ্যাতি অর্জন করতে পারবে, যদি ইংরাজী সাহিত্যের মাধ্যমে গড়ে ওঠা তার রুচি ও প্রতিভাকে সে মাতৃভাষার সেবায় কাজে লাগায়।)

[গৌরদাসকে লেখা পত্রাংশ—সংসদ]

মধুসূদনের ইতিহাস পাঠে বহিরাগত বাহিনীর ভারত আক্রমণের কাহিনী বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। রামায়ণের যুগের বহিরাগত আর্যদের মতো, আধুনিক কালের ইংরাজদের মতো, মধ্যবর্তী পর্যায়ে গ্রীক আক্রমণও মাইকেলের স্বদেশ প্রেমিক মনে ক্ষতচিহ্ন রেখে গেছে। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে, মাত্র উনিশ বৎসর বয়সের লেখা ছয়খণ্ডের King Porus থেকে উদ্ধৃতি দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে ঃ—

"But where, oh ! Where is Porus now ?
And where the noble hearts that bled
For Freedom—with the heroic glow
In patriot-bosoms nourished
—Hearts, eagle-like that recked not Death.
But shrank before foul Thraldom's breath ?
And where art thou fair Freedom—thou.
Once goddess of Ind's sunny clime !

(কিন্তু হায় ! কোথা সেই বীরপুরু এরে ?
কোথায় সে দেশপ্রেমী মহান হৃদয়
যোদ্ধৃবৃন্দ—যারা সবে স্বাধীনতা তরে

শ্যেনদৃষ্টি প্রহরীর ন্যায় ছিল সদা
জাগ্রত-হৃদয় ? আর কোথা হায় সেই
অস্তমিত স্বাধীনতা রবি, একদিন
উদ্ভাসিত সমুজ্জ্বল ছিল যে বিরাজি !)

(ভাবানুবাদ লেখকের)

এ কবিতাংশ থেকে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, 'মাইকেল' হবার অনেক আগেই মধুর মনে দেশাত্মবোধ অঙ্কুরিত হয়েছে। আর এই কবিতাতেও ভারতে বহিঃশত্রুর আগমণের সেই একই নক্সা বার বার ঘুরে ঘুরে এসেছে। অধিকাংশ আগ্রাসী আক্রমণ ও অভিযানই সিন্ধু পার হ'তে এসেছে।

মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যে "রামচন্দ্র" আবির্ভূত ঐ বহিরাগত আর্যদের প্রতিভূ হিসাবে। বাল্মীকি রামায়ণেও "অসুররাজ রাবণ" শুধু বড় যোদ্ধাই নন, উপরন্তু অতীব সুপণ্ডিত, জ্ঞানী, মহাদেবের বর প্রাপ্ত পুরুষ। মধুর কাছে 'হিরো'।

সেই রাবণ বধ বহিরাগত আর্যদের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল—দাক্ষিণাত্য তথা সমগ্র ভারত ভূখণ্ডে আর্যদের উপনিবেশ স্থাপনের জন্য। এর জন্য সমস্ত আর্য দেব দেবীরা রামচন্দ্রকে শুধু হাতিয়ার দিয়ে, যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করেই সাহায্য করেননি, উপরন্তু যাবতীয় নীতি-বিরুদ্ধ পৃষ্ঠপোষকতা করতে, রাবণকে ছলে-বলে-কৌশলে পরাজিত করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

মাইকেলের সহানুভূতি তাই স্বাভাবিকভাবেই দেশীয় নৃপতি রাবণের দিকে। মেঘনাদ বধ কাব্য তাই শুধু অমিত্রাক্ষর ছন্দের সার্থক প্রয়োগই নয়, ভাষা, ছন্দ, রচনাশৈলীতে যতই চমৎকারিত্বের দাবী থাকুক না কেন, মেঘনাদ বধ কাব্যের মহৎ সাহিত্যে উত্তীর্ণ হবার মূল কারণ, তার বিষয়বস্তুর নূতনত্ব, তার দৃষ্টিভঙ্গীর অসাধারণত্ব, এবং সর্বোপরি, তার অন্তর্নিহিত দেশাত্মবোধ। □

['ঈশ্বরচন্দ্রের রামচন্দ্র দর্শন'—শিরনামায় শ্রীসোমেশ দাশগুপ্ত মহাশয় একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধসংকলন প্রকাশ করেছেন। ও'র অনুমতি নিয়েই পত্রিকার এই সংখ্যায়, রচনার দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'মাইকেলের চোখে রাম আগ্রাসী প্রতিভূ'—পুনর্মুদ্রণ করা হল 'অনার্য' ॥]

মার্কিন সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন —কিছু কথা

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

ভারতের আধা সামন্ততান্ত্রিক, আধা উপনিবেশিকতাবাদী মানসিকতার ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার ভোগবাদী অবক্ষয়ী সংস্কৃতির মোহজাল শহর শহরতলী ছাড়িয়ে সুদূর গ্রামাঞ্চলে বিস্তার করে চলেছে—ধ্বংস করছে গ্রামীন সুপ্রাচীন লোকায়ত সংস্কৃতির ইতিবাচক দিকগুলি।

আজ ভারতের সাধারণ মানুষ নয়া অর্থনৈতিক শোষণে জর্জরিত পাশাপাশি মার্কিনী পন্যসংস্কৃতির প্লাবনে প্লাবিত।

সাধারণ মানুষের কাছে এই সহজ সত্যটুকু ধরা নাও পড়তে পারে। কিন্তু বাস্তব সত্য হল এই যে ভারতবর্ষের শহর ও গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনে অবক্ষয়ী মার্কিনী পন্যবিপণন সংস্কৃতির প্রভাব অত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করেছে। শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য খেলাধুলা এমনকি বিবাহবাসর থেকে শোকবাসর—সর্বত্রই সাম্রাজ্যবাদী পন্যবিপণন সংস্কৃতির দাপট।

ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রভু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘ দুশো বছরের শাসনকালে আমাদের ভাষা মূল্যবোধ, মানবিক সম্পর্ক, লোকায়ত শিল্প সংস্কৃতির শিকড়ে আঘাত করতে পেরেছিলো কী ?

মাইকেল মধুসূদন ইংরাজী শিক্ষা, ইয়োরোপীয় জ্ঞান চাইছিলেন, পোষাকে চালচলনে ইয়োরোপীয় হতে চাইছিলেন, আবার সেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ বলিষ্ঠ করে গেলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসনকালেই রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করেছিলেন এক বিকল্প সংস্কৃতির জগৎ। ঔপনিবেশিক রাজধানীকে প্রত্যাখ্যান করে বীরভূমের রুক্ষ মাটিতে রবীন্দ্রনাথ সাহসিকতার বীজ পুঁতেছিলেন।

আজ মার্কিনী মাসমিডিয়াগুলো সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের সাংস্কৃতিক

শিকড় উপড়ে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। মূলত এই উদ্দেশ্যগুলো মাথায় রেখে ঃ

১) অর্থনৈতিক—নিজস্ব পনোর জন্য বাজার দখল করা। (বিশ্ব টি ভি বাজারের এক-তৃতীয়াংশ দখল করে রেখেছে মার্কিন টেলিভিশন কোম্পানী)

২) রাজনৈতিক গণচেতনা কলুশিত করে নিজস্ব রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করা।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে রাজনীতির আয়তক্ষেত্রে জনগণকে তার নিজস্ব কৃষ্টি ও সংহতির ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা, মিডিয়া দ্বারা লাগাতার প্রচারের মাধ্যমে তার অংশীদারে পরিণত করা। একই সাথে ভারতীয় লোক-সমাজের যোগসূত্রগুলোকে উচ্ছেদ করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন একক মানুষে পরিণত করা।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এমন একটা সমাজ তৈরী করতে চায় যে সমাজে কোন রেজিমেন্টেশন থাকবে না। প্রচলিত হবে মুক্ত গণতন্ত্র, সামাজে থাকবে টেনশন বা অনিশ্চয়তা। উন্নতির একমাত্র মাপ হবে অর্থনীতি। জাতীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি, মূল্যবোধ, মানবতা, বৈজ্ঞানিক যুগে অচল—এমন কিছু বন্ধ ধারনা সমাজে ইনজেক্ট করে দিতে হবে।

আজকের সাংস্কৃতিক চিত্রটি উপলব্ধি করতে গেলে পাঁচ-র দশক থেকে সাত-র দশকের যৎসামান্য আলোচনার প্রয়োজন থেকেই যায়। ভারতবর্ষে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপ এবং তার সংস্কৃতির আবির্ভাব ও আক্রমন কোন কাকতালিয় ব্যাপার নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির জনগণের উপর অর্থনৈতিক শোষণের জন্য যে নিওকলোনাইজেশন নীতি চালু করছিল, সেই সুবাদেই ভারতবর্ষের আপোষ-কামী সরকারের সহযোগিতায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পাঁচ দশকের শেষ দিকে শিল্পের উন্নতির নামে পুঁজি বিনিয়োগ করতে থাকে, বাজার দখল ও মুনাফার উদ্দেশ্যে অবক্ষয়ী সংস্কৃতির বীজ সুকৌশলে বপন করতে থাকে, যার মূল লক্ষ্য ছিলো যুব সমাজ। যুব-সমাজই যে-কোন দেশের আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র আবার তারাই ভোগবাদী প্রচারের বলি হয়।

পাঁচ দশকের শেষ ভাগ থেকে ছয়-র দশক জুড়ে যুব সমাজের একটা অংশের

মধ্যে হলিউডের 'কাউবয়' ইমেজ অনুকরণ করার তীব্র প্রতিযোগিতা ছিলো। বার্ট ল্যাঙ্কেস্টার, এল-প্রেসলি, গ্রেগরি পেক, ডিন মার্টিন, মেরলিন মনরো, লিজ-টেলার ইত্যাদি হলিউডের নায়ক-নায়িকাদের হাভভাব চালচলন, পোষাকের অনুকরণে ব্যস্ত ছিল বম্বে ফিল্ম ইনডাস্ট্রির নায়ক-নায়িকারা, আবার এদের প্রভাবে বহুমাত্রায় প্রভাবিত ছিল ভারতীয় শাসকশ্রেণীর উচ্চপদস্থ আমলা বাজারী লেখকগোষ্ঠী এবং তথাকথিত প্রগতিশীল সংস্কৃতির ধারকবাহক কিছু ব্যক্তিবিশেষ।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় যুবসমাজ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে হলিউডের সংস্কৃতি আর ভোগবাদী মানসিকতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে নিজস্ব ভোগ্যপন্যের বাজারটি সুকৌশলে তৈরী করছিল। আবার পাশাপাশি পাঁচ ও চার দশকে গোটা ভারত জুড়ে যুবসমাজের মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের একটি রাজনৈতিক বাতাবরন কাজ করছিল এবং শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনই ছিল যার বার্তাবাহক। ফলে 'বিবর' 'রাত ভোর বৃষ্টি' 'পশ্চিমবঙ্গ একটি প্রমোদ তরণী' নামক যৌন আবেদন মূলক উপন্যাসগুলি যুবমানসে সাড়া জাগাতে পারেনি। ৬২-র চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ, ভারত রক্ষা আইনে প্রতিবাদী শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মীদের কারারুদ্ধ করা, উত্তাল গণসাংস্কৃতিক আন্দোলনের চাপে পড়ে 'কল্লোল' নাটকের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার প্রমাণ করে তৎকালিন বিক্ষুব্ধ সময়, বিকৃত মার্কিন সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে কঠিন চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। যুবসমাজের বড় অংশের মধ্যে ছিল আমূল সমাজ পরিবর্তনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ছয়-র দশকের শেষ ভাগ থেকে সাত-র দশকের প্রথমার্ধে ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া লাওসের মুক্তিযুদ্ধ ভারতীয় যুবসমাজের কাছে প্রেরণাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ এটা বিজ্ঞানগতভাবে প্রমাণ করে যে গোটা দুনিয়া জুড়ে রাজনৈতিক পরিবেশের উপর সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি নির্ভরশীল। আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা এবং মুক্তিপাগল ইন্দো-চীনের জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই-র প্রতিফলন ভারতবর্ষের যুবসমাজের মধ্যে ছিল। পৃথিবীব্যাপী গণ আন্দোলনের প্রতি উৎসাহিত যুবজনতার সম্মিলিত প্রয়াসে রচিত হচ্ছিল অনবদ্য সংগ্রামী সংস্কৃতি।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পাশাপাশি ভারতের মাটিতে আমদানি করছিল হিপী সংস্কৃতি, এল, এস, ডি হতাশা অবাধ যৌনতার দর্শন। এটা করতে বাধ্য

হয় রাজনৈতিক কারণেই—উদ্দেশ্য সমাজতন্ত্রকে আটকানো এবং মুক্ত গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা।

৭০—৭৭ সাল পর্যন্ত শাসকশ্রেণী রাজনৈতিক বিক্ষোভগুলি দমন করে পুরোপুরি ফ্যাসিস্ত কায়দায়। অবাধে গণহত্যা চালিয়ে দেশপ্রেমের পতাকা উড়াতে থাকে। লক্ষণীয় বিষয় যখন ভারতের বুকে ইন্দিরাতন্ত্রের ফ্যাসীবাদী আগ্রাসন তখন শোধনবাদী রাশিয়া ভারতবর্ষের মাটিতে থাবা চাটছে—সমর্থন করছে জরুরী অবস্থাকে। প্রগতিশীল বলে দাবী করেন এমন প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী, তথাকথিত গণসাংস্কৃতিক বাবুরা নির্লজ্জভাবে রাশিয়ার সেই সময়ের ভূমিকাকে সমর্থন করেছিলেন। শুধু ভারতবর্ষে নয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পন্য বিপনন সংস্কৃতির খোলাবাজারের রাস্তা মসৃণ করেছে সংশোধনবাদীরাই। সুতরাং গোটা সাত-র দশকের আলোকোজ্জ্বল গনসাংস্কৃতিক সময় ও তার পাশাপাশি অন্ধকারময় ফ্যাসীবাদী আক্রমণের সামান্যতম বিশ্লেষণ এই আলোচনায় দাবী রাখে।

১৯৪৭ সালের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের মদতপুষ্ট ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী যেমন শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলনের উপর নির্মম দমন পীড়ন নামিয়ে এনেছিল তেমন অন্যদিকে ভারতীয় শাসকপুষ্ট সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদী জগত নগ্ন প্রচার চালিয়েছিল গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে, ৬০-র দশককে চীন ভারত সীমান্ত বিরোধের প্রেক্ষাপটে 'হকিকৎ' চলচ্চিত্র উগ্রদেশপ্রেমের মডেলস্বরূপ। ৭০ দশকে 'প্রেমপূজারী' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রচারিত হয় কুৎসা, অপপ্রচার ও বিকৃত যৌনতা। ৭৫-র জরুরী অবস্থা ঘোষণা, তৎকালিন শোধনবাদী রাশিয়ার প্রত্যক্ষ সমর্থন, আর সাংস্কৃতিক বিনোদনের নামে 'বাবি', 'জুলির' মত বিকৃত অবক্ষয়ী চলচ্চিত্রের প্রভাব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ভারতবর্ষের শাসকগোষ্ঠী রং-বেরং-র সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদীদের মুক্ত ঘাটি গঠনে যথাসম্ভব চেষ্টা চালিয়েছে।

ইন্দিরা সরকার জরুরী অবস্থায় রবীন্দ্রনাথকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল প্রকৃত বামপন্থী প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক কর্মীদের কথা বাদ দেওয়া গেল কেন না তারাই ছিল সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত শত্রু। সুতরাং তারা জেলবন্দী হবেন—খুবই স্বাভাবিক, সাধারণ গণতান্ত্রিক লেখক বুদ্ধিজীবীদেরও কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। অথচ বোম্বের ফিল্ম ইনডাস্ট্রির ক্রেদাক্ত পন্যবিপনন সাংস্কৃতিক বাজারটি ছিল

রমরমা—শুধুমাত্র মুনাফার চিৎকার। একথা পরিষ্কার ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক বাজারটি মূলত সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি দ্বারা লালিত পালিত।

আজকের খোলাবাজার, অ্যাডকালচার পেপসিতন্ত্রের ধ্বংসাত্মক সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসের বীজ তো ৭০ দশকের শেষ ভাগেই পোঁতা হয়েছিল বিশ্ব ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই তৃতীয় বিশ্বে। বহুজাতিক অনুপ্রবেশ ও তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গ্যাট-চুক্তি ডাংকেল প্রস্তাব তার পরবর্তি অধ্যায়। □

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

২০শে জানুয়ারী '৯৬ শনিবার
দূরদর্শন-কতৃপক্ষের ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে
লোকসাংস্কৃতিক শিল্পী, গণসঙ্গীতশিল্পী, সাংস্কৃতিক সংস্থা
বুদ্ধিজীবী-সাহিত্যিকদের বিক্ষোভ অবস্থান
এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।
গড়ফগ্রীন, দূরদর্শন ভবনের সামনে।
আপনাদের উপস্থিতি এবং সহযোগিতা আশা করি।

সল্টলেক অনার্য সাংস্কৃতিক সংস্থা

নভেম্বর '৯৪-র থেকে '৯৫-র নভেম্বর পর্যন্ত সল্টলেক অনার্য সাংস্কৃতিক সংস্থার চালচলন নিয়ে কিছু কথা

অগুন্তি সাংস্কৃতিক সংগঠন 'প্রাতিষ্ঠানিক বকলশ' গলায় বেঁধে বাজার সংস্কৃতির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে আর নয়ত সরকারী বদান্যতায় প্রগতিশীল তকমা কপালে সেঁটে 'ড্রয়িংরুম সংস্কৃতিতে' ব্যস্ত। এমনও দেখা যায় উদ্যোক্তারা মাত্র কয়েক বছর সংগঠন চালাবার পর সস্তা মনমালিন্যের শিকার হয়, তারপর সংগঠন লাটে তুলে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যায়।

আমরা প্রথম বছরটিতে এই ধরনের 'আর্য' সংস্কৃতি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি। আশা করছি গৃহিত কর্মসূচী অনুযায়ী আগামী বছরটিতেও নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে পারব।

নভেম্বরের '৯৪তে সংগঠন তৈরী করার পর টানা পাঁচমাসের প্রস্তুতি নিয়ে আমরা ১১ই মে '৯৫ জ্ঞানমঞ্চে নাচ, গান, নাটকের মাধ্যমে আমাদের প্রথম প্রয়াস মঞ্চস্থ করি।

প্রযোজনা সংখ্যা –১ঃ

ঋত্বিক ঘটকের 'কমরেড' গল্পটিকে আমরা নাট্যরূপ দিতে পেরেছি। নাটকটি মাত্র এক বারই প্রযোজিত হয়েছে। আমাদের নাটক 'কমরেড' আপোসকামী শ্রমিক আন্দোলনের বিরোধিতা করে।

যে বিভাগের ধারাবাহিকতা আছেঃ

নাচ ও গানের বিভাগটির জন্য আমরা কিছুটা আনন্দ প্রকাশ করতে পারি। এ যাবৎ কোলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে খোলা মঞ্চে এই বিভাগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পেরেছি।

পত্রিকাও একটি বিভাগ ঃ

৯৪-র নভেম্বরে গৃহিত সিদ্ধান্ত ছিলো ত্রৈমাসিক সাংস্কৃতিক পত্রিকা প্রকাশ করবে আমাদের সংস্থা। প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেছিলাম মাত্র ৩০০ কপি। প্রথম সংখ্যাটিকে পাঠকেরা খুব উচ্চ প্রশংসা করেননি আবার 'নিম্নমানেরও' বলেননি বা 'দুরছাই'ও করেননি। অনার্য পত্রিকা আপনাদের সহযোগতা চায়। লেখা পাঠান, গ্রাহক হোন, পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখুন।

আমরা পত্রিকাকে খোলাবাজারে আলুপটলের মত বিক্রি করার বিপক্ষে।

যৌথ আন্দোলন প্রসঙ্গে কিছু কথা ঃ

বর্ষপূর্তিতে যৌথ সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে আমরা এটুকু বলতেই পারি যে, লোককৃষ্টি পরিষদের উদ্যোগে গড়ে উঠা 'সমবেত সাংস্কৃতিক প্রয়াস'-এর আমরা অন্যতম শরিক। আমাদের সংস্থা সাধ্যমত চেষ্টা করেছে লোককৃষ্টি পরিষদের সাথে যৌথভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনটি চালানোর।

গণসংস্কৃতির নামে সংকীর্ণ খোপ আর সস্তা রাজনীতির গলিতে ঘোরাফেরা আমাদের কাছে সংস্কৃতি বিরোধী বলে মনে হয়। তাই প্রকৃত যৌথ আন্দোলনের প্রতি আমাদের আকর্ষণ তীব্র। বাস্তব সত্য হল, সংঘবদ্ধ সাংস্কৃতিক মিছিলের স্লোগান কখনোই যান্ত্রিক ইতিহাস সৃষ্টি করে না বরং যে পরিশ্রমী শরীর দিয়ে সমবেত মানুষ, পৃথিবীটাকে নান্দনিক করে তোলে সেই সমবেত মানুষই চায় যৌথ সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

অনুষ্ঠানের জন্য অনুষ্ঠান নয় অনার্যদের প্রতিবাদ অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে ঃ

১২ই নভেম্বর শনিবার সল্টলেক কে. বি ব্লকে আমাদের উদ্যোগে তৃতীয় সমবেত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

আমরা কে. বি কে. সি অঞ্চলে অনুষ্ঠান করলাম ওখানকার বেশ কিছু সচেতন মানুষের আবেদনে।

সম্প্রতি জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে, কে. বি ব্লক জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটি প্রয়াত

সলিল চৌধুরী স্মরণে যে মঞ্চটি করেছিল সেই মঞ্চে উপস্থাপিত হয় পাঁচ থেকে দশ বছরের ছোট ছোট মেয়েদের নিয়ে Miss KB-KC সুন্দরী প্রতিযোগিতা তৎসহ মধ্যরাত পর্যন্ত অসুস্থ হিন্দী গানের চিৎকারের সাথে কোমর দুলিয়ে অশ্লীল নাচ। আমরা কিন্তু দেখলাম এর 'বিপরীত সংস্কৃতি' সামনে রাখলে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজন পাশে থাকেন। যারা বলেন—'কে. বি, কে. সি-র মত মিশ্র ভাষাভাষি অঞ্চলে কিছু হবে না', তাদের নিরাশ করে রাত ৯টা পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করলেন প্রতিবেশীরা এবং উৎসাহ দিলেন। সেদিন বর্তমান সাংস্কৃতিক পরিবেশকে তীব্র তীক্ষ্ম সমালোচনা করলেন প্রধান বক্তা মাননীয় সুধী প্রধান মহাশয়। দর্শকাসনে উপস্থিত থেকে আমাদের প্রয়াসকে সমর্থন জানালেন শৈবাল মিত্র, সোমেশ দাশগুপ্ত, চিত্তপ্রসাদ রায়। বাংলাদেশের রবীন্দ্রচর্চা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান রফিক অহমেদ মহাশয়কে আমাদের অনুষ্ঠানে নিয়ে আসেন যুগান্তর পত্রিকার অসিত রায়। লোক কৃষ্টি পরিষদ পরিবেশিত গণসঙ্গীত আর আমাদের ছোট্ট সদস্যরা যে আবৃত্তির আসর বসিয়েছিল তার রসাস্বাদন করেন উপস্থিত শ্রোতা-দর্শকমণ্ডলী। বিপুল-অনুশ্রী পরিবেশিত প্রতিষ্ঠান বিরোধী গান, একবাক্যে প্রশংসা করেন শ্রোতা-দর্শক বন্ধুরা। শেষে পরিবেশিত হয় আমাদের সংস্থার সমবেত সঙ্গীত। গণবিষাণ আগাম জানিয়ে দিয়েছিলেন অনিবার্য কারণ বশত ও'রা আসতে পারবেন না।

অনুষ্ঠানের শেষে বহু মানুষ আমাদের কাছে আবেদন নিয়ে আসেন—আমরা যেন ধারাবাহিকতা বজায় রাখি।

বর্ষপূর্তিতে আমরা সল্টলেক অনার্য সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই—

সুধী প্রধান ও শৈবাল মিত্রকে, যখন যেভাবে চেয়েছি আমাদের সঙ্গে ওরা থেকেছেন এবং কথা দিয়েছেন আমাদের সংগ্রামে সাথী হয়ে থাকবেন। সোমেশ দাশগুপ্ত, অসিত রায়, ক্ষিতিশচন্দ্র সাহা, বিপুল চক্রবর্তী, অনুশ্রী চক্রবর্তী, গণ বিষাণ শ্রমিক সাংস্কৃতিক চক্রকে এবং গণবিষাণ শ্রমিক সাংস্কৃতিক চক্রের সক্রিয় কর্মী, দীগন্ত মুখার্জী, স্বপন ভট্টাচার্য, অসীম সান্যাল, পত্রিকার গ্রাহক, পত্রিকার বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ আমাদের সাহায্য এবং সহযোগিতা করার জন্য। ধন্যবাদ জানাই আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের।

যে কোন সাংস্কৃতিক সংগঠনকে প্রকৃত দক্ষতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় শক্তপোক্ত করতে সময় লাগে বেশ কিছু বছর। আমাদের বয়স মাত্র এক, সবে দাঁড়াতে শিখছি—এখনো হাঁটতে হবে অনেক অবাধ্য পথ। □

একটি বিধিসম্মত ঘোষণা ঃ—পত্রিকা বিভাগের সম্পাদক বিপ্রতিপ বিশ্বাস ব্যক্তিগত অসুবিধার দরুন 'অনার্য' সম্পাদনা করতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন এই সংখ্যা সম্পাদনা করেছেন—শ্যামল মণ্ডল।

অমিত মুখার্জী
সম্পাদক
সল্টলেক অনার্য সাংস্কৃতিক সংস্থা

পীপ্‌ল্‌স্‌ রাইটার্স ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত

"ওরা আমাদের ধ্বংস করতে পারে
কিন্তু পরাজিত ?
না—কখনোই না"।

অন্ধ্রপ্রদেশের 'পীপ্‌ল্‌স্‌ রাইটার্স ফেডারেশন' (পি ডব্লু এফ) বিপ্লবী প্রগতিশীল লেখকদের সংগঠন। রাষ্ট্রীয় নীপিড়নের কাঁটা পথ মাড়িয়ে অনেক রক্তাক্ত অভিজ্ঞতাকে জড় করে, আজ থেকে দশ বছর আগে এই সংগঠনের জন্ম।

সম্প্রতি কাঁকিনাড়া জেলা শহরে ১৪ এবং ১৫ই অক্টোবর '৯৫ ওদের চতুর্থ সম্মেলনঅনুষ্ঠিত হয়ে গেল। আমন্ত্রিত প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের সংস্থার মুখপত্র 'অনার্য' পত্রিকার পক্ষ থেকে স্বাতী চ্যাটার্জী, অমিত মুখার্জী ওদের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

১৪ তারিখ সকাল দশটায় অন্ধ্রের জনপ্রিয় প্রবীন সাহিত্যিক কালিপত্তম রামারাও [ছদ্মনাম 'কারা'] পি. ডব্লু. এফ-র পতাকা উত্তোলন করেন। সাহিত্যিক কারা ১৯৩৫ সাল থেকে সাহিত্য চর্চা করছেন ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা, থেকে বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থা, ওঁকে সুনজরে দেখেনি বরং বিভিন্ন কায়দায় বিব্রত করে চলেছে এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো।

পতাকা উত্তোলনের পর অন্ধ্রপ্রদেশের অরুনাদয় সাংস্কৃতিক সংস্থার জনাকুড়ি প্রতিনিধি ও আমাদের প্রতিনিধি গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

এরপর সম্মেলনের কাজ শুরু হয় বিশিষ্ট লেখক 'নাম্মুর' সভাপতিত্বে। সর্বপ্রথম বক্তব্য রাখেন সাহিত্যিক কারা তারপর এক এক করে 'অনার্যের' পক্ষে অমিত মুখার্জী, স্বাতী চ্যাটার্জী' অরুনাদয়ের ৮০ বছরের অশীতিপর বৃদ্ধ চারণ কবি কানুরী ভেঙ্কটেশ্বর রাও, [এই মানুষটি তেলেঙ্গানা কৃষক আন্দোলন থেকে গণসঙ্গীত, লোকনাটকের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত] পীপ্‌ল্‌স্‌ উয়োমেনস অরগানাইজেশনের প্রতিনিধি সূর্যকুমারী। দলিত আন্দোলনের প্রতিভাশালী

কবি-সাহিত্যিকরা এবং অন্যান্য জেলা থেকে আগত বিভিন্ন পত্রিকার আমন্ত্রিত প্রতিনিধিরা।

কারার বক্তব্যের সারমর্ম ছিলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত ঘুরে ভারতবর্ষ এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতে। সাহিত্য আন্দোলনকে, আমরা এক সময় তীব্র করেছিলাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে, সেই আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে ·····। কথা প্রসঙ্গে, অতীতের প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের যান্ত্রিক অভ্যাস ও দুর্বলতাকে সমালোচনাও করেন।

কারার বক্তব্যকে সমর্থন করে অমিত মুখার্জী, স্বাতী চ্যাটার্জী বলেন 'যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আমরা বক্তব্য রাখছি' সে মাটি আপোসহীন সংগ্রামী 'মা ভূমি'··· ···গত ১৮ বৎসর ধরে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে শিল্প-সাহিত্য চর্চা, প্রগতিশীলতার মোড়কে সংস্কারবাদী ভড়ং ছাড়া অন্য কিছু নয়। প্রতিভাবান লেখক শিল্পীরা প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত। আমাদের মত কিছু সংস্থা, ছোটপত্রিকা, শিল্পী, কবি-সাহিত্যিক লড়াইটা চালাবার চেষ্টা করছে ··'। ওরা বিপ্লবী কবি সুষ্ঠারাও পানীগ্রাহী, চেরাবান্দারাজুর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলেন—'সফ্‌দার হাসমির মৃত্যুতে আন্তরিকতার সাথে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবাদী শিল্পী কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা ধিক্কারে ফেটে পড়েছিলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার শহীদ কবি সরোজ দত্তের খুনিদের শাস্তি 'গণতান্ত্রিক পশ্চিমবঙ্গে' এখনো হল না ···।

কানুরী ভেঙ্কটেশ্বর রাও বলেন '···আমরা গ্রামের মানুষ। মাটি চষে ফসল ফলাই, মাটির গন্ধে পাই গানের কথা। ··· ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি আমাদের ফসলের খেত শাসকের ভারি বুটের দাপটে নিষ্পেশিত ·····জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শাসকের বিরুদ্ধে গান লিখব, গান গেয়ে যাবো।

'পুরুষ শাসিত সমাজে, পুরুষ বিরোধীতার নামে রচিত হচ্ছে বিমূর্ত, অশ্লীল, দুর্বোধ্য সাহিত্য। অবাধ যৌনতাই নারী মুক্তি আন্দোলনের আদর্শ—এরকমই একটা ধারণার জন্ম দিচ্ছে। মতাদর্শহীন নারীমুক্তি আন্দোলনের সাহিত্যিকরা শৃঙ্খল-মুক্তির নামে বিশৃঙ্খলাকেই মদত দিচ্ছেন ···। প্রকৃত নারী মুক্তি আন্দোলনের সাহিত্য রচিত হোক শ্রেণী সচেতনতার নিরিখে···'। সূর্যকুমারীর জ্বালাময়ী ভাষনকে সমর্থন জানায় উপস্থিত প্রতিনিধিরা।

দলিত আন্দোলনের বিদগ্ধরা দাবী করেন, 'ভারতবর্ষের বিপ্লবী প্রগতিশীল

লেখকরা দলিত সমস্যাকে এযাবৎ পাশ কাটিয়ে এসেছেন'।

বিভিন্ন জেলার পত্র-পত্রিকার প্রতিনিধিদের ভাষনের পর সম্মেলনের প্রথমপর্ব শেষ হয়।

কাঁকিনাড়া জেলা কলেজের অবসর প্রাপ্ত ইংরাজীর অধ্যাপক, কবিতা-সমালোচক আদ্যাপল্লি রামমোহন রাও-র পরিচালনায় বিকালবেলায় সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়।

বিষয়ঃ ১। সাম্প্রতিক কবিতার সমালোচনা

২। বিতর্কঃ মার্কসবাদী দৃষ্টিকোনে অম্মেদকার

সম্মেলনের দিনে কবিতা সমালোচনা এবং বিতর্কসভা কেন? সরকারী প্রচার মাধ্যম যতই চিৎকার করুক না কেন—ব্রাহ্মণ্যবাদ বর্ণবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতাকে উচ্ছেদ করছেন-করবেন কার্জত এই কাঠামো সামন্তবাদী ব্যবস্থাটিকে সুকৌশলে লালন পালন করছে। অন্ধ্রের দলিত আলোলনে জড়িত কবি সাহিত্যিকদের রচনা সতেজ শক্তিশালী কিন্তু অধিকাংশ কবি সাহিত্যিকরা, দলিত মুক্তির প্রশ্নে শ্রেণী বিশ্লেষনের গভীরে না গিয়ে—ধ্রুপদী মার্কসবাদকেই আক্রমন করছেন। বিতর্ক সভা জমে ওঠে যুক্তি আর পাল্টা মুক্তির অবতারণায়।

১৫ তারিখ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনঃ

উপস্থিত প্রতিনিধিরা মনযোগ দিয়ে অনুধাবন করলেন তেলেগু সাহিত্যের অধ্যাপক আই ভেঙ্কটরমন (হিমাজওয়ালা)-র শরৎ সাহিত্যের উপর দীর্ঘ গবেষণামূলক প্রয়োজনীয় ভাষণ। হিমাজওয়ালা শরৎ সাহিত্যের অনুবাদক যিনি 'শরৎচন্দ্র ও জাতিয়তাবাদী আন্দোলন'—এই বিষয়ের উপর গবেষণা করেছেন।

সে দিনই পি. ডব্লু. এক-র সভ্যরা তর্ক-বিতর্ক চালিয়ে ১৫জন কার্য্য-নির্বাহী সমিতি সদস্য নির্বাচিত করলেন। নব নির্বাচিত সভাপতিঃ হিমাজওয়ালা। সাধারণ সম্পাদকঃ জীবন। পি. ডব্লু-এক-র চতুর্থ সম্মেলনের গৃহিত সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ—সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মতামত। সমালোচনাকে গুরুত্ব দেয় এবং সমর্থন জানায় আমাদের সংগঠন। আমরা মনে করি সাহিত্যের ভাষা খুঁজতে হবে জনসাধারণের সংগ্রামী ভূমিকা থেকে। আমরা এও মনে করি বন্দুকের নল দিয়ে সাহিত্য রচনা করা যায় না। ·· ধ্রুপদী মার্কসবাদ-ই সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ বিজ্ঞান। লোককৃষ্টি লোক-

সংস্কৃতির ইতিবাচক দিকগুলোকে, ভারতীয় জনসাধারণের সুমহান সাংস্কৃতিক ইতিহাকে রক্ষা করার আহ্বান জানিয়ে সাধারণ সম্পাদক আমাদের প্রতিনিধিদের বলেন—'ভারতবর্ষের অনু-পরমানুকেও বন্ধক দিয়ে দিয়েছে বর্তমান শাসক-গোষ্ঠী। এখনই উপযুক্ত সময়, গড়ে তুলতে হবে সাম্রাজ্যবাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবী, দেশপ্রেমী গণতান্ত্রিক কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকদের যুক্ত ফ্রন্ট।

সন্ধ্যায় আদ্যাপল্লি রামমোহন রাও-র পরিচালনায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১০০ জন প্রবীন-নবীন কবিরা স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনায়। সেদিন রাত্রেই হিমাজওয়ালা মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে তেলেগু ভাষায় লেখা কবিতা ইংরাজীতে অনুবাদ করে দেন যেহেতু পরের দিনই আমাদের প্রতিনিধিদের কলকাতায় ফিরে আসতে হবে। কবিতাটির ভাবা অনুবাদ আমরা ছাপলাম। তেলেগু ভাষা থেকে 'বিদেশী ভাষা ইংরাজীতে' অনুবাদ করার পর, তার ভাবানুবাদ করা হল—কবিতাটির শরীর কতটা হৃষ্ট-পুষ্ট? আমাদের কাছে এর চেয়েও বড় প্রশ্ন, কবিতার মস্তিকটি উন্নত মানের কিনা।

ওরা আমাদের ধ্বংস করতে পারে
কিন্তু পরাজিত? না—

ও মা
আমাদের প্রিয় মা!
ওরা আমাদের যতই প্রয়োজনহীন আর বোকা মনে করুক না কেন,
আমাদের উপর নামিয়ে আনুক না কেন ধমক তার প্রহার,
আমরা কিন্তু আবর্জনার স্তূপের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে চাই না।
আমরা হতে চাই জ্ঞানী—
যতই ওরা আমাদের অপ্রয়োজনীয় আর বোকা বলুক না কেন।

আমরা যদি মূলোৎপাটিত বিচ্ছিন্ন হয়ে,
নামহীন কলঙ্কিত হয়ে,
পাঁকের মধ্যে কীট-পতঙ্গের মত ঘুরে বেড়াই
ওরা শকুনের মত আনন্দে ডানা ঝাপটাতে থাকে।

ওরা মনে করে আমরা অপ্রয়োজনীয়
প্রতিনিয়ত করে রক্তাক্ত নির্মম কষাঘাতে
কারণ আমরা গভীর অন্ধকার থেকে উঠে আসছি
হাঁটতে চাইছি মাথা উঁচু করে আলোর দিকে।

ওরা বলে আমরা অপরাধী!
কারণ আমরা মানুষকে বলি জীবন মানে শুধুই সংগ্রাম।
লড়তে লড়তে যখন আমাদের রক্ত ঝরতে থাকে—
আমরা যখন ক্ষতবিক্ষত হয়ে তোমার উপর পড়ে যাই
তোমাকে আঁকড়ে ধরতে চাই—
ওরা ঘোষণা করে ঃ
আমরা পরাজিত ব্যর্থ।

ও মা
আমাদের প্রিয় মা!
আমরা তো জানি তোমার স্পর্শে আমরা কত সুদর্শন-সুন্দর,
কিন্তু ওরা বলে আমরা নাকি হিংস্র আর কুৎসিৎ!
অথচ আমরাই অনুভব করি নিরন্ন-মানুষের মর্মবেদনা—
আমরা তো বুঝি এই শৈল্পিক পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা
অগণিত মানুষের কর্মঠ হাত।

ওরা যত খুশী চিৎকার করুক
ওদের চিৎকার করতে দাও
আমরা সত্যকে পাই না ভয়।
ওরা আমাদের ধ্বংস করতে পারে—
কিন্তু পরাজিত?
না—কখনোই না।

জনার্দ/বাহান

মা

ও আমাদের প্রিয় মা !

ওদের হাতেই আমাদের স্বর্গ—

ওই স্বর্গটাকে ছিনিয়ে আনতে হবে

ওরা আমাদের যতই প্রয়োজনহীন আর বোকা মনে করুক না কেন।

এমন একটা সচেতন সম্মেলনে আমাদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে পীপ্‌ল্‌'স্‌ রাইটার্স ফেডারেশনের সকল সভ্যদের জানাই উষ্ণ সাংস্কৃতিক অভিনন্দন। এছাড়া আন্তরিক ধন্যবাদ রইল সেইসব কর্মীদের প্রতি যাঁরা ১৩ তারিখ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত একনিষ্ঠ ভাবে দোভাষির কাজ করেছেন। ওদের সাহায্য না পেলে সম্মেলনের বিবরণ পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে পারতাম না। □

Space doatned by—

★

★ ★

A WELL WISHER

With best compliments :

HINDUSTHAN FABRICATORS

Office Address : 100/40, Jessore Road,
Dum Dum, Calcutta-700 074

Factory : 104, Jessore Road,
Dum Dum, Calcutta-700 074

Dial : 551 0402, 551 0917 (Off. & Fac.)
551 0902 (Resi.)

Fabricator and Erector for dairy, chemical and other Allied Industry.

সভ্যতার ইতিহাসে ৬ই ডিসেম্বর '৯২ এই দিনটার কোন স্থান নেই।
ধর্মও-ফ্যাসিবাদী নেতারা যারা বাবরী মসজিদ ভেঙ্গেছিলো,
তারা বুক ফুলিয়ে এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে।
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা আমাদের সামাজিক
দায়িত্ব কর্তব্য।

ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়ে চলেছে
স্বাতী চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস
ঃ সূর্যের সারথীরা ঃ

প্রস্তুতি সংখ্যা—২ * অক্টোবর—ডিসেম্বর '৯৫ * বিনিময় মূল্য ঃ ৭ টাকা